মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা-৬

প্রকাশক

প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ

১৫ নভেম্বর ১৯৬৫

প্রচ্ছদলিপি

সোমজিৎ দাশগুপ্ত

মুদ্রক

পরিমল বসু
বসুশ্রী প্রেস
৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

বিষয়-সূচী

॥ ১ ॥

ঐতিহ্যবিচারে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী

মার্কসীয় দৃষ্টিতে ঐতিহ্যবিচারের প্রশ্নটি নানা দিক থেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র মানবতার সঞ্চিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, উভয় সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। যে-সব দেশ নতুন সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সংস্কৃতি রচনার কাজে নিযুক্ত সেখানে তো এটি আশু প্রয়োগের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর যে-সব দেশে এখনও সেই পরিস্থিতি দেখা দেয় নি সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এটি একটি অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য।

মার্কসবাদের শত্রুরা অবিরাম প্রচার করে যে, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মার্কসবাদের মনোভাব হল নেতিবাচক ও বর্জনমূলক। এরা কতকগুলি বিমূর্ত ধারণাকে ইতিহাস-নিরপেক্ষ, পরিবেশ-নিরপেক্ষ, শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এবং শ্রমজীবী-জনগণকে সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করার অভিযানে অত্যন্ত তৎপর। এদের প্রচার ও বুলিগুলি এত সুপরিচিত যে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে ঐ প্রচার-অভিযানের প্রভাবকে আদৌ উপেক্ষা করা চলে না। জনগণের পশ্চাৎপদ অংশ তো বটেই, বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ অংশও নানাভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। দেখা যায় যে অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক তত্ত্ব হিসাবে মার্কস-বাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে মার্কসবাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের মনে নানাবিধ সংশয় ও বিভ্রান্তি রয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক মার্কসবাদী ঐ সব প্রশ্নে মার্কসীয় শিক্ষার মূলসূত্রগুলিকে এমন অতিসরলীকৃত এবং যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের চেষ্টা করেন যে, তার দ্বারা উপরিউক্ত সংশয় ও বিভ্রান্তিকে আরো দৃঢ় হতে সাহায্য করা হয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়ার সেবায় আত্ম-নিযুক্ত তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁদের মনে সত্যকার বিভ্রান্তি তথা সংশয় রয়ে গিয়েছে তাঁদের সঙ্গে সহিষ্ণু আলোচনা ও চিন্তা-বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলির নিরসন করা মতাদর্শগত সংগ্রামের একটি আবশ্যিক অঙ্গ।

উপরিউক্ত কর্তব্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঐতিহ্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা খুবই প্রয়োজন। নতুবা মার্কসীয় শিক্ষার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং অতি সরলীকরণের বিপরীত আর-এক ধরণের বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। মার্কসবাদ যে-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বর্জন করে না এবং তা যে দেশের ঐতিহ্যের প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এটি দেখাবার উদ্দেশ্যে মার্কসবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ উক্ত ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিকের কথা যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই, ইতিহাস ও পরিবেশ-নিরপেক্ষ বিমূর্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাতে উদারনৈতিক মনোভাব গ্রহণের বা তাকে প্রশ্রয়দানের যথেষ্ট অবকাশ রয়ে যায়।

যতদূর জানি আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা এযাবৎ হয়নি। তাই বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের দিক থেকে, নিজের অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও, ২।৩ বৎসর আগে একটি মাসিক পত্রিকায়[১] এই বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছিল। 'ক্রান্তি'র সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আবারও সেই কঠিন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।

ঐতিহ্যবিচারে মার্কসীয় পদ্ধতির মূলসূত্রকে দুইটি প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ করা যায় (১) শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নতুন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি রচনার জন্যে মানবতার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন (২) সেই জ্ঞানভাণ্ডার তথা উত্তরাধিকারকে শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে।

প্রতিজ্ঞা দুটি একই দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যের দুই দিক হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। যে কোন একটিকে বাদ দিলে অথবা তার গুরুত্বকে ছোট করে দেখলে এক ধরণের বা অপর ধরণের বিচ্যুতি দেখা দিতে বাধ্য।

প্রয়োগের দিক থেকে এই প্রশ্নটি সোভিয়েত রাশিআয় অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে অত্যন্ত জরুরী এবং আশু কর্মসূচীর অঙ্গে পরিণত হয়। তখন কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট নিম্নরূপে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন: পুরাতন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদের জমিতে এবং তা পুঁজিবাদেরই প্রতিফলন ও পুঁজি-বাদী আদর্শের বাহক। সুতরাং তা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী হতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীকে যে-সমাজ গড়ে তুলতে হবে তা পুরনো সমাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, অতএব পুরাতন সংস্কৃতি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী হতে পারে না। লেনিন উপরিউক্ত ধারণাগুলিকে খুব বিপজ্জনক মনে

করতেন। তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে ও তরুণদের নিকট প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতায় ঐ ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে: প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কোনো অজ্ঞাত দুনিয়া থেকে হঠাৎ উদ্ভূত হয়নি এবং তা তথাকথিত প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্কপ্রসূত আবিষ্কার নয়। পূর্ববর্তী সমাজগুলিতে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে তারই স্বাভাবিক বিকাশের ফল হতে হবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে। একথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, মানবতার বিকাশের সমগ্র পর্যায়ে সৃষ্ট সংস্কৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ এবং এই সংস্কৃতিকে নতুন রূপদানের দ্বারাই প্রলেতারীয় সংস্কৃতি রচনা করা সম্ভব।[১] ঐ প্রসঙ্গেই অন্যত্র তিনি বলেন: মার্কসবাদ যে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শরূপে বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে, তা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, মার্কসবাদ বুর্জোআ যুগের সবচেয়ে মূল্যবান কৃতিগুলিকে বর্জন করা দূরে থাকুক বরং মানব-চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়ায় দুইহাজার বৎসরেরও বেশি সময় ধরে সঞ্চিত অধিকতর মূল্যবান উপাদানগুলিকে আপন করে নিয়ে নতুন রূপদান করেছে।[২]

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বৈজ্ঞানিক মূল্যবিচারের দ্বারা কি-ভাবে তার অকেজো অংশকে বাতিল এবং কার্যকরী অংশকে গ্রহণ ও সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করতে হয় সেই পদ্ধতির প্রাথমিক রূপটি আমরা দেখতে পাই স্বয়ং মার্কস ও এঙ্গেলসের মার্কসবাদের উত্তরণের প্রক্রিয়া অধ্যয়নের মাধ্যমে।

মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েরই জন্ম হয়েছিল বুর্জোআ পরিবারে। শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণে পথিকৃতের ভূমিকা পালনের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল তাঁদের পরিবেশে যে-সব ধ্যানধারণার আধিপত্য ছিল সেগুলির গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে আসা। কিন্তু ঐ পদক্ষেপ আদৌ নেতিবাদী ছিল না। প্রথমে তাঁরা প্রধান প্রধান দার্শনিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক মতবাদকে সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করেন, সমাজ-বাস্তবের মানদণ্ডে বিচার করে দেখেন এবং নতুন নতুন ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অভ্যুদয়, পুঁজিবাদের অতি-উৎপাদনের সংকট ইত্যাদির তাৎপর্য বিশ্লেষণ-দ্বারা সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রচলিত মতবাদ, ভাবধারা ইত্যাদির মূল্যায়ন করেন। প্রথমে তাঁরা একাজে প্রবৃত্ত হন ভাববাদী ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে।

মার্কসবাদের সুনির্দিষ্ট রূপগ্রহণের প্রক্রিয়ায় দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়:

১. লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড
২. ঐ

(১) মার্কস-এঙ্গেলসের ভাববাদী ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অবস্থানকে অতিক্রম করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অবস্থানে উত্তরণ (২) দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের মূলসূত্রগুলিকে রূপদান। প্রথম স্তরে পেঁছিবার জন্যে মার্কস-এঙ্গেলসকে বস্তুত মানবতার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে মন্থন করতে হয়েছে, আয়ত্ত করতে হয়েছে প্রচলিত অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক মতবাদগুলি এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হয়েছে। লেনিন তাঁর এক বিখ্যাত বক্তৃতায় মার্কসবাদের তিনটি প্রধান উৎসের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি হল যথাক্রমে (১) জার্মান ক্লাসিকাল বা চিরায়ত দর্শন, বিশেষত হেগেলীয় দর্শন (২) ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিজ্ঞান (৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ।

মার্কস-এঙ্গেলস উপরিউক্ত উৎসগুলিকে সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন, সেগুলির ত্রুটি-দুর্বলতা-অসম্পূর্ণতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দ্বারা নতুন ঐতিহাসিক পরিবেশের উপযোগীভাবে এগিয়ে নিয়েছেন, আর নেতিবাচক দিকগুলিকে বর্জন করেছেন। যাঁরা মার্কসীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখেন তাঁদের কাছে এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার দরকার করে না। তাছাড়া বিশদ বিবরণদান একটিমাত্র প্রবন্ধে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি কথার উল্লেখে সীমিত থাকতে হচ্ছে।

মার্কস, হেগেলীয় ভাববাদী-দ্বন্দ্ববাদের বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল খোসাকে বর্জন করেন কিন্তু তার প্রগতিশীল শাঁসকে গ্রহণ করেন। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের রূপ ভাববাদী, তিনি বিশ্বপ্রবাহকে দেখেছেন Absolute Idea-র (অনপেক্ষ ভাব) আত্ম-সচেতনতার বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে এবং তৎকালীন প্রুশীয় সামন্তযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেই সেই বিকাশের সর্বোচ্চ রূপ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মার্কস, হেগেলীয় দর্শনের এই ভাববাদী-রহস্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকটিকে দেখেই ক্ষান্ত হননি। হেগেলীয় দর্শনের যা প্রাণবস্তু তা হল দ্বন্দ্ববাদ, অর্থাৎ তিনি বিশ্ব ও ইতিহাসের প্রবাহকে দেখেছেন বিরোধাত্মক বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে এবং দ্বন্দ্ববাদকেই বিকাশের সর্বজনীন নিয়ম বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এর আগে বিভিন্ন দেশের প্রাচীন দর্শনে দ্বন্দ্ববাদের অংকুরের দেখা পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেগুলি ছিল সহজ সরল ও প্রাথমিক পর্যায়ের। হেগেলই দ্বন্দ্ববাদকে একটা সামগ্রিক রূপদান ও সর্বজনীন নিয়ম হিসাবে উপস্থিত করেন। এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। মার্কস-এঙ্গেলস সেই অবদানকে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, তাকে

জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের সমসাময়িক অগ্রগতির আলোকে সঠিকভাবে উপস্থিত করেন।

ইংলণ্ডের চিরায়ত অর্থনীতিবিজ্ঞান ছিল উদীয়মান বুর্জোআশ্রেণীর অর্থনৈতিক মতবাদ এবং তার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামন্ত ভূস্বামীদের অর্থনৈতিক আধিপত্য। সেই মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারা প্রমাণ করেন যে, সম্পদ সৃষ্টি হয় শ্রমের দ্বারা, প্রকৃতি বা বাণিজ্যের দ্বারা নয়। এইভাবেই তাঁরা Law of Value (মূল্যের নিয়ম) আবিষ্কার করেন। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার দরুণ তাঁরা সেই তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। মার্কস Law of Value-কে ভিত্তি হিসাবে নিয়েই আবিষ্কার করেন Law of Surplus Value (উদ্‌বৃত্ত মূল্যের নিয়ম) এবং তা পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে অন্যতম মুখ্য হাতিয়ারে পরিণত হয়।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারা পুঁজিবাদী শোষণের নিষ্ঠুর ও বীভৎস দিকটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন কিন্তু এইটিই তাঁদের একমাত্র অবদান নয়। মানুষে মানুষে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সব যুগে অর্থাৎ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর থেকে একভাবে, না-হয় অন্যভাবে ধ্বনিত হয়ে এসেছে। সাম্যের আদর্শ একরূপে বা অন্যরূপে সেই আদিম সাম্যবাদী যুগ থেকে প্রচলিত আছে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তারা অসাম্য ও শোষণের মূল উৎসটিকে আবিষ্কার করেন! তাঁরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকবে না, উৎপাদনের মাধ্যমগুলি হবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি এবং সমাজের সকল সভ্যের যৌথ শ্রমের দ্বারা সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে। এটিই হল তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু নিজেদের সমসাময়িক পরিবেশে দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার দরুণ তাঁরা ঐরূপ সমাজপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত পথ খুঁজে পাননি, সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন নিজ মস্তিষ্কে, ভেবেছেন যে শিক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে ধনবানদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মার্কস-এঙ্গেলস কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের উক্ত প্রবক্তাদের অবদানকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি তাঁদের মতবাদের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

তাঁদের সমকালীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলিকে, যথা শক্তির সংরক্ষণতত্ত্ব, জীবকোষের আবিষ্কার এবং সর্বশেষে ডারউইনের তত্ত্বকে বিশ্লেষণের দ্বারা মার্কস-এঙ্গেলস সেগুলিকে নতুন আলোকে ও পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করেন। ঐসব আবিষ্কর্তারা নিজেরা তাঁদের আবিষ্কারের যুগান্তকারী তাৎপর্য বা বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির রূপায়ণে সেগুলির সম্ভাব্য

ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বরং তাঁদের কেউ কেউ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-দৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত হতেন তার বিপরীত জীবনদর্শনে অর্থাৎ ভাববাদে-অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলে মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের অবদান-গুলিকে গ্রহণে দ্বিধা করেননি।

মার্কস-এঙ্গেলস প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদ বিশেষত ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদেরও মূল্যায়নের দ্বারা ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ ও ত্রুটি, দুর্বলতা, ভ্রান্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদ বস্তুর তথা মানব-দেহের সঙ্গে মানবচেতনার সম্পর্কের প্রশ্নটি একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করে। তা প্রমাণ করে যে, মানবচেতনা, চিন্তা ইত্যাদি হল বিশেষভাবে সংগঠিত বস্তুর (মানবমস্তিষ্কের) একটি বিশেষ গুণ এবং মানবমস্তিষ্কে বহির্জগতের প্রতিবিম্ব। এইটি হল প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদের অবদান। কিন্তু তা বস্তুকে বিকাশমান ভাবে অধ্যয়নে অর্থাৎ বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বাত্মক চরিত্র এবং পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ ইত্যাদিকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা এবং মানুষের কার্যকলাপকে সামাজিক মানুষের কার্য-কলাপ হিসাবে দেখা ইত্যাদিতে সমর্থ হয়নি। এইজন্যই তা পরিবর্তনকে এক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি এবং মানবমস্তিষ্কে বহির্জগতের প্রতিফলনকে নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন বলে মনে করে। মার্কস-এঙ্গেলস ঐ ব্যর্থতার কারণের উপর আলোক-সম্পাত করেন, ত্রুটি ও ভ্রান্তিগুলিকে বর্জন করেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের ভাববাদী ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি তাঁদের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা-দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সেইজন্যই তাঁরা দর্শনের চিরাচরিত ভূমিকাকে অস্বীকার করে তার বৈপ্লবিক অর্থাৎ পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নির্দেশ করেন। 'ব্যবহার বা প্রয়োগই সত্যের কষ্টিপাথর'—দর্শনের ক্ষেত্রে এই যুগান্ত-কারী সূত্রটিকে তাঁরা রূপদান করেন।

ঐতিহ্যবিচারে মার্কসীয় পদ্ধতির আরেক দিকের সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায় নব্য-হেগেলীয় দর্শন, রিকার্ডোর পরবর্তী যুগের বুর্জোআ অর্থনীতিবিজ্ঞান এবং পাতি-বুর্জোআ সমাজতন্ত্রবাদের সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেলসের মনোভাব পর্যা-লোচনায়। তখন পুঁজিবাদের বিকাশ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, তার সংকটের চরিত্র অনেক পরিস্ফুট এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের মূল চরিত্র অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদন অথচ উৎপাদনের মাধ্যমের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এই দুইয়ের সংঘাত স্পষ্ট, ধনিক ও শ্রমিকের শ্রেণীদ্বন্দ্ব অনেক তীব্র ও উচ্চতর পর্যায়ে

উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। সেই পরিবেশে নব্য-হেগেলীয় দর্শন, বুর্জোআ অর্থনীতিবিজ্ঞান ও পাতি-বুর্জোআ সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদির ভূমিকাকে মার্কস-এঙ্গেলস সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করেছেন। সেগুলির মধ্যে পূর্বসূরী মতবাদগুলির ইতিবাচক দিকের আর অস্তিত্ব নেই এবং তারা ইতিহাসের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এবার ঐতিহ্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতির মূলসূত্রগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক এবং ঐতিহ্যের সাধারণীকৃত রূপ অর্থাৎ ভাবাদর্শ (Ideology)-কে নেওয়া যাক দৃষ্টান্ত হিসাবে।

অতীত যুগগুলির ভাবাদর্শকে বিচার করা হবে কোন্ দৃষ্টিতে, পরিপ্রেক্ষিতে ও পটভূমিতে? ভাববাদীরা বিচার করে সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অথবা সেই পটভূমির কথা নিতান্ত মামুলী ধাঁচে উল্লেখ করে। মার্কসবাদীরা দেখবেন যে (১) কোন্ অর্থনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিতে তার উদ্ভব হয়েছে এবং সমসাময়িক কালে তা কোন্ সামাজিক শ্রেণীর ভাবাদর্শরূপে কাজ করেছে ও সাধারণভাবে সমাজ ও মানুষের চিন্তার বিকাশে তার ভূমিকা কি ছিল? (২) পরবর্তীকালে চিন্তা-প্রবাহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বিভিন্ন যুগেই বা তা কি ভূমিকা পূরণ করেছে?

সংক্ষেপে বলা চলে যে, মার্কসবাদীরা বিষয়টিকে বিচার করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের কষ্টিপাথরে। কিন্তু এটি তো হল অত্যন্ত সাধারণীকৃত বক্তব্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই সূত্রের নিতান্ত যান্ত্রিক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তাই বিশদভাবে আলোচনার জন্য বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন। যথা (১) ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন হয় কিভাবে এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? (২) ভাবাদর্শে দৃষ্টিভঙ্গী তথা শ্রেণীস্বার্থ কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়? (৩) এক যুগের ভাবাদর্শ অন্যযুগের ভাবাদর্শকে কিভাবে প্রভাবিত করে? (৪) এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে রূপান্তরের পর পূর্ববর্তী সমাজের সমস্ত অঙ্গেরই কি ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং সেগুলিকে বর্জন করে সব কিছুকেই কি নতুনভাবে রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়? (৫) সর্বোপরি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের কষ্টিপাথর বলতে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং সামগ্রিকভাবে কি বোঝায়?

একটি মাত্র প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে উপরে উল্লিখিত সমস্ত প্রশ্নগুলির দূরে থাকুক, একটিরও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়—সে-কথা আগেই বলে রাখা ভালো। যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়নে আগ্রহশীল তাঁরা যদি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত

বক্তব্যগুলিকে মার্কসবাদের চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন তাহলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

প্রথমে ধরা যাক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কষ্টিপাথরের কথা। কেননা এটির সম্বন্ধে যান্ত্রিক এবং অতিসরলীকৃত ধারণা পোষণ করলে তা থেকে সমস্ত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। কেউ কেউ শ্রেণী-দ্বন্দ্বের তত্ত্ব বলতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শুধু শোষণ ও নিপীড়ন এবং প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু দেখেন না। ফলে তাঁরা এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্রভুশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের এতটুকু লেশ রয়েছে এমন সবকিছুই বুঝি বর্জনীয় ও নিন্দনীয়। বলাবাহুল্য যে এরূপ ধারণা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে দেখে নিতান্ত একপেশেভাবে এবং তার ফলে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ঘটনা অধ্যয়নে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের বদলে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ঘটে।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অতীত ইতিহাসের বিশ্লেষণে হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত হননি। এই প্রসঙ্গে নিছক পুরাতন বস্তুবাদের সমালোচনা করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, তা সমগ্র অতীত ইতিহাসকে দেখে যুক্তিহীনতা ও হিংসার একটি কদর্য স্তূপ হিসাবে। কিন্তু আধুনিক বস্তুবাদ ইতিহাসকে দেখে মানবজাতির বিবর্তনের প্রক্রিয়ারূপে এবং সেই প্রক্রিয়ার নিয়মগুলিকে অধ্যয়নের চেষ্টা করে।[১]

অতীতে সমাজ শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং ইতিহাসের অগ্রগতি হয়েছে ঐ দুইয়ের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে। সেটা হয়েছে সমাজবিকাশের প্রবাহের বা প্রক্রিয়ারই অমোঘ নিয়মে। সেই অতীত স্তরগুলিতে উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অনুন্নত ছিল বলেই ইতিহাসকে অপরিহার্যভাবে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস ইতিহাসের অগ্রগতি তথা সামাজিক প্রগতি বলতে বুঝেছেন প্রধানত উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতি। এই নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির মাধ্যমেই মানবতা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন নতুন জয় অর্জন করে চলেছে। শ্রমের লাঘব, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং আত্মিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করছে। সেই যুগগুলিতে উৎপাদিকাশক্তি তথা সমগ্রভাবে ইতিহাসকে এগিয়ে নেওয়ার ভার পড়েছে সমাজের সুবিধাভোগী পরশ্রমভোগী সংখ্যালঘু অংশের উপরে এবং বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের বরাতে জুটেছে শুধু কঠোর শ্রম। এঙ্গেলস লিখেছেন যে ইতিহাসকে এই দৃষ্টিতে অধ্যয়নের দ্বারাই অতীতের শ্রেণীশোষণের স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নতুবা তাকে বুঝতে হত মানুষের দুষ্ট চরিত্রের

১ সোশিয়ালিজম, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইউটোপিয়ান।

তত্ত্বের সাহায্যে। ইতিহাসের উক্ত ব্যাখ্যাই আবার অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে বর্তমানে উৎপাদিকাশক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে মানবজাতিকে শাসক ও শাসিত, শোষক ও শোষিত এই দুইভাগে ভাগ করে রাখার সপক্ষে শেষ অজুহাতটিরও পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে।[১]

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের গোড়ার দিকে যে সহজ সরল (এঙ্গেলসের ভাষায় 'কাঁচা') কমিউনিজমের ধারণা মাথা তোলে সে-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস উক্ত ধারণার প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়াশীল দিকের কথাও উল্লেখ করেন। মার্কসের মতে উক্ত 'ইউটোপিয়ান কমিউনিজম' যে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক রূপান্তর সাধনের কথা চিন্তা করত সেইটি হল তার প্রগতিশীল দিক। কিন্তু ঐ ধারণা যে আদিম খ্রীষ্টধর্মের অনুরূপভাবে সর্বজনীন কৃচ্ছ্রসাধন এবং অত্যন্ত কাঁচা ধরণের সামাজিক একীকরণের মতবাদ পোষণ করত সেটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল দিক। কেননা সেক্ষেত্রে সমাজকে সেই আদিম যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে হয়।

শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপ শুধুমাত্র শাসন ও শোষণে সীমিত ছিল না। প্রত্যেক সমাজেই একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত তারা উৎপাদিকাশক্তির উন্নতি এবং সমগ্রভাবে সমাজের অগ্রগতির ভূমিকা পূরণ করেছে। অগ্রগতিলব্ধ ফলগুলির সিংহভাগ তারাই একচেটিয়া করে রেখেছে। তারপর একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে সেই ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। পুরাতন উৎপাদন-সম্বন্ধ উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকে পরিণত হয়েছে। পুরাতন সামাজিক সম্বন্ধ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি সামাজিক প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সংঘাত যখন চরমে পৌঁছায় তখনই দেখা দেয় সমাজ-বিপ্লব।

শাসকশ্রেণীর ভূমিকা যতদিন ইতিবাচক ছিল ততদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সেই শ্রেণীর ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন কৃতি মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সেই অগ্রগতির চরিত্র শাসকশ্রেণীর জীবনদর্শনের দ্বারা সীমিত ছিল এবং ব্যবহারিক জীবনে তা প্রযুক্ত হত প্রভুশ্রেণীর শাসন ও শোষণকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে।

নতুন উৎপাদিকাশক্তি ও পুরাতন উৎপাদন-সম্বন্ধের মধ্যে সংঘাত যত এগিয়ে চলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ততই তীব্রতর হয় এবং উদীয়মান শ্রেণীর অর্থাৎ নতুন উৎপাদিকাশক্তির ধারক ও বাহকদের ভাবাদর্শ প্রভুশ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিভিন্ন যুগের সমাজে উদীয়মান

১ এঙ্গেলস অন কার্ল মার্কস, মার্কস-এঙ্গেলস সিলেক্টেড ওআর্কস।

শ্রেণীগুলিকেও প্রভুশ্রেণীর সৃষ্ট অবদানগুলির এবং তার ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের সৃষ্ট সম্পদের সাহায্য নিতে হয়, সেগুলিকে সম্প্রসারিত করতে ও নতুন রূপ দিতে হয়। শাসকশ্রেণীর ইতিবাচক ভূমিকা যখন নিঃশেষিত হয়ে যায় তখন আসে তার অবক্ষয়ের অধ্যায়। সেই অধ্যায়ে তার ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের রচনায়ও নেমে আসে ঘন কালো ও বীভৎস ছায়া।

মার্কসবাদ বিভিন্ন যুগের সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস অধ্যয়নের সময় এই দ্বন্দ্বমূলক প্রতিক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেয় এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত সংগ্রামে অস্ত্র যোগায়। শাসকশ্রেণীর চিন্তা-প্রতিনিধিদের অবদানকে যেমন মূল্যবিচার ছাড়া গ্রহণ করে না তেমনি নেতি-বাচক ও নৈরাজ্যবাদী ধরণে নস্যাৎ করেও দেয় না।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রগুলিকে যাঁরা যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁরা কোন সমাজের ভাবাদর্শে অর্থনৈতিক ভিত্তির সরাসরি প্রতিফলন খোঁজার ও ভাবাদর্শকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করে থাকেন। এই ভুলের দরুণ (১) অর্থনৈতিক ভিত্তি ও ভাবাদর্শ উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধকে দেখা হয় বিকৃতভাবে (২) ভাবাদর্শের নিজস্ব ক্ষেত্রে তার আপেক্ষিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয় (৩) সমাজ বিকাশের সাধারণ পটভূমিতে ভাবাদর্শের বিকাশের যে নিজস্ব ধারা হয়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়।

উপরিউক্ত তিনটি বিকৃতির পরিণাম হয় সমাজজীবনে ভাবাদর্শের গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকাকে ছোট করে দেখা এবং কার্যত স্বতঃস্ফূর্ততা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের কাছে আত্মসমর্পণ। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা এই ধরণের ভুল করেননি বরং সে সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৮৯০ সালে জে. ব্লশ-এর নিকট লিখিত একটি চিঠিতে এঙ্গেলস বলেন ঃ

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে বাস্তব জীবনে উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনই ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে। মার্কস এবং আমি এর বেশী কিছু বলিনি। যদি কেউ আমাদের বক্তব্য বিকৃত করে বলে যে অর্থনৈতিক উপাদানই একমাত্র নির্ধারক উপাদান তাহলে সে সূত্রটিকে একটি অর্থহীন বিমূর্ত প্রলাপবাক্যে পরিণত করে। অর্থনৈতিক অবস্থা হল ভিত্তি (basis) কিন্তু সৌধের (superstructure) অন্তর্গত অন্যান্য অঙ্গ, অন্যান্য উপাদান যথা, শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক রূপ ও ফলাফল, সফল সংগ্রামের পর বিজয়ীশ্রেণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধান, আইনকানুনের রূপ, সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের মস্তিষ্কে বাস্তবের প্রতিবিম্ব, রাজনীতি, আইনের তত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐগুলির কতকগুলি অনড় সূত্রে পরিণতি ইত্যাদি ইতিহাসের

সংগ্রামগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রামের রূপ নির্ধারণে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। ঐ সমস্ত উপাদানগুলি পরস্পরের উপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে এবং ঐ প্রক্রিয়া অগ্রসর হয় অসংখ্য ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে (ব্যতিক্রম বলতে বোঝায় সেই প্রপঞ্চ বা ঘটনা যার আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র এত সুদূর বা প্রমাণ করার পক্ষে কঠিন যে আমরা সেগুলির অস্তিত্ব নেই বলে ধরে নিই)। শেষপর্যন্ত অবশ্য অর্থনৈতিক গতির দ্বারাই ঐ প্রক্রিয়ার চরিত্র নির্ধারিত হয়। এই কথা ভুলে গিয়ে ইতিহাসের কোন যুগের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রয়োগের চেষ্টা তাকে প্রাথমিক অঙ্কের মত সহজ করে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

এঙ্গেলসের জীবনকালে মার্কসবাদের অনুগামীরা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে যে-সব ভুল করেন তা শুধরে দেওয়ার জন্য এঙ্গেলস যে-সব চিঠিপত্র লেখেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি যথা এইচ. স্টারকেনবুর্গ; সি. স্মিট; এফ. মেরিং প্রভৃতির নিকটে লিখিত চিঠিগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাবাদর্শ সৃষ্টি এবং ভাবাদর্শে অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন ও ভাবাদর্শের নিজস্ব ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এঙ্গেলসের মতামতের সারমর্ম হল নিম্নরূপ ঃ

যাঁরা চিন্তাবিদ্ বা ভাবাদর্শের প্রবক্তা তাঁরা সচেতনভাবে কাজ করেন 'বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তু'র এবং পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া উপাদানগুলির মাধ্যমে। বলা যায় যে, ঐ উপাদানগুলিকে তাঁরা চিন্তার কাঁচামাল হিসাবে গ্রহণ করেন, পরীক্ষা ছাড়াই বিশুদ্ধ চিন্তার ফল বলে মেনে নেন এবং চিন্তার ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র তথা দূরবর্তী কোন উৎস-সন্ধানের প্রয়োজন বোধ করেন না। যথা, যিনি ইতিহাসের চর্চা করেন (ইতিহাস অর্থে এঙ্গেলস এখানে রাষ্ট্র, আইনব্যবস্থা, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি ভাবাদর্শের সমস্ত অঙ্গের কথা বলেছেন) তিনি মনে করেন যে সঞ্চিত উপাদানগুলি পূর্বপুরুষের চিন্তা থেকে উৎপন্ন এবং উত্তরপুরুষের মস্তিষ্কে নিজস্ব বিকাশের স্বাধীন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ঘটনা ঐ বিশেষ ক্ষেত্রের বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু চিন্তাবিদেরা ধরেই নেন যে ঐ সমস্ত ঘটনাও চিন্তার প্রক্রিয়ারই ফল, সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের ঘটনার প্রভাবও চিন্তাজগতের বাইরের জিনিস নয়। প্রকৃত যে-চালিকাশক্তিগুলি চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলি চিন্তাবিদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়, তা না হলে ঐ প্রক্রিয়া আর ভাবাদর্শগত প্রক্রিয়া থাকে না।

ভাবাদর্শের ক্ষেত্র অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে বহুদূরে অবস্থিত এবং তার

বিকাশের নিজস্ব ধারা ও আপেক্ষিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সেখানে অর্থনীতির প্রতিফলন হয় খুবই পরোক্ষভাবে এবং উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া উপাদানগুলির মাধ্যমে। সেখানেও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাধান্যই শেষপর্যন্ত জয়ী হয় এবং নিজের ছাপ ফেলে কিন্তু তা হয় ঐ বিশেষ ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট সীমা ও অবস্থা অনুসারে। যথা, দার্শনিক চিন্তার উপর অর্থনীতির প্রভাব পড়ে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে। এখানে অর্থনীতি কোন নতুন উপাদান সৃষ্টি করে না, প্রচলিত পুরাতন চিন্তা-বস্তু কিভাবে পরিবর্তিত ও বিকশিত হবে তার ধারা নির্ধারণ করে।

এঙ্গেলস বলেছেন যে, ঐ সব কারণেই ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের দেখা মেলে অনেক বেশী পরিমাণে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে যত দূরে অবস্থিত এবং বিমূর্ত ভাবাদর্শের যত নিকটে অবস্থিত ততই তার বিকাশের ধারা বক্ররেখায় অগ্রসর হয় ও সেখানে ব্যতিক্রমের দেখা পাওয়া যায়। সেই বক্ররেখায় গড়পড়তা অংকটি অবশ্য অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার অক্ষের প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে।

চিন্তাবিদ্ বা ভাবাদর্শের প্রবক্তাদের জীবনদৃষ্টি মূলত তাঁদের সামাজিক তথা শ্রেণী-পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে সে প্রভাব কাজ করে পরোক্ষ-ভাবে। সেইজন্যই কেউ কেউ নিজস্ব শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডিকে অতিক্রম করে আসতে সমর্থ হন। সুতরাং ভাবাদর্শে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সরাসরি প্রতিফলন অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থের অবিকল প্রতিচ্ছবি রূপে দেখার চেষ্টা খুবই যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তেমনি যদি শাসকশ্রেণীর ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের কৃতি বিচারের বেলায় ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভাবাদর্শ সৃষ্টি করেছেন সেটাও নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার হয়; তার বদলে ভাবাদর্শকে বিচার করতে হবে তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক পটভূমিতে, তা সমাজের বিকাশে কি ভূমিকা পূরণ করেছে সেই মাপকাঠিতে। অবশ্য যারা শোষকশ্রেণীর সচেতন মুখপাত্র কিংবা ভাড়াটে প্রচারক তাদের কথা আলাদা।

কোন শ্রেণীর সঙ্গে তার রাজনৈতিক-সাহিত্যিক তথা চিন্তা-প্রতিনিধিদের কি সম্পর্ক সে-বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের রচনার বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন। যথা 'দি এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট' নামক বইটিতে মার্কস তৎকালীন ফ্রান্সের সোশাল-ডেমোক্রাসি বা পাতি-বুর্জোআ গণতান্ত্রিক মতবাদ সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

ঐ মতবাদের সারমর্ম হল সমাজের গণতান্ত্রিক রূপান্তরসাধন, তবে পাতিবুর্জোআদের গণ্ডির মধ্যে রূপান্তর। তাই বলে এটা ধরে নেওয়া

উচিত নয় যে, পাতি-বুর্জোআরা নীতিগতভাবে তাদের সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে চায়। বরং তারা মনে করে যে তাদের মুক্তির বিশেষ পরিবেশই আধুনিক সমাজের মুক্তির ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার সাধারণ পরিবেশ রূপে কাজ করতে পারে। গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের প্রত্যেকেই দোকানদার বা দোকানদারদের স্বার্থের উৎসাহী সমর্থক এরূপ মনে করাটাও ভুল। পাতি-বুর্জোআরা বাস্তবজীবনে যে-গণ্ডি অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না, উক্ত প্রতিনিধিরা চিন্তার ক্ষেত্রে সেই গণ্ডির মধ্যেই সীমিত থাকেন, সুতরাং প্রথমোক্তদের বৈষয়িক স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থানের দরুণ তাদের সামনে যে-সব সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্ন দেখা দেয় শেষোক্তেরা অর্থাৎ চিন্তা-প্রতিনিধিরা তত্ত্বগতভাবে সেই-সব সমস্যার সম্মুখীন এবং তার সমাধানে প্রবৃত্ত হন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। পুঁজিবাদী সমাজে, বিশেষত তার অগ্রগতি ও সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ যেমন সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে ওঠে এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চরিত্র যত পরিষ্কার হয় পূর্ববর্তী সমাজগুলিতে তা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সেখানে পুরাতন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত উদীয়মান শ্রেণী নিজেকে জনগণের সমস্ত অংশের প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করেছে এবং তার চিন্তা-প্রতিনিধিরা সমগ্র জনগণের কল্যাণের জন্য মতবাদ প্রবর্তন করেছেন বলে ভেবেছেন। সেইসব মতবাদ বা ভাবাদর্শের অন্তর্বস্তুর চরিত্র মূলত উদীয়মান শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থের দ্বারা নির্ধারিত হলেও তা সমগ্র জনগণের কল্যাণ কামনার আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। অতএব ভাবাদর্শে বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিফলনের প্রক্রিয়াটিকে অধ্যয়নের সময় উক্ত উভয় দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

ভাবাদর্শে অর্থনীতির এবং শ্রেণী-স্বার্থের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখার চেষ্টা সম্বন্ধে লেনিনের কয়েকটি বক্তব্যের উল্লেখ করা যাক। লেনিনের 'ফিলজফিকাল নোটবুক'[১] নামক বইটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে দেখা যায় ১৯০৮ সালে ভি. শুলিয়াটিকভ নামে জনৈক মার্কসবাদীর লিখিত 'The Justification of Capitalism in West European Philosophy (From Descartes to E. Mach)' বইটির একটি 'নোট' লেনিন তৈরি করেছেন। নোটে উক্ত গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারমর্ম এবং তার পাশে লেনিনের মন্তব্য দেওয়া আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় মাত্র দু-একটি দৃষ্টান্ত-দানে সীমিত থাকতে হচ্ছে।

১, লেনিন, কালেক্টেড ওআর্কস, ৩৮শ খণ্ড।

(১) শুলিয়াটিকভ বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজার দর্শন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন ঃ

Spinoza's conception of the world is the song of triumphant capital, of all-consuming, all-centralising capital. There is no being, there are no things, apart from the single substance ; there can be no existence for producers apart from the large-scale manufacturing enterprises.

লেনিন এই বক্তব্যের পাশে মন্তব্য করেছেন—'infantile' (চ্যাংড়ামি) ।

(২) দার্শনিক লাইবনিভস সম্বন্ধে শুলিয়াটিকভের বক্তব্য ঃ

Leibnitz's God is the owner of an exemplarily organised enterprise and is himself the supreme organiser.

লেনিনের মন্তব্য—'Phrase-mongering'.

(৩) শুলিয়াটিকভের বক্তব্য :

In the seventeenth century, at the time of its 'storm and stress', the English bourgeoisie preached the doctrine that everything in the world should be explained as a motion of material particles taking place from mechanical necessity. The English bourgeoisie were laying the foundations for large-scale capitalist economy···They imagined the whole world in the form of an organisation of material particles united in accordance with on immanent laws.···

লেনিনের মন্তব্য ঃ

'In this vulgarisation of the history of philosophy, the struggle of the bourgeoisie against feudalism is completely forgotten.'*

অতীত যুগগুলি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভাবাদর্শে ও ধ্যানধারণায় কিভাবে সমাজবিকাশের বিভিন্ন যুগের বাস্তব অবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে নতুন অন্তর্বস্তু ও নতুন তাৎপর্য দান করে সেই বিবর্তনের প্রতিক্রিয়াকে এঙ্গেলস

* শুলিয়াটিকভের বক্তব্যের উদ্ধৃতির যে-সব অংশের নীচে দাগ দেওয়া সেগুলি দিয়েছেন লেনিন নিজে।

তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' নামক বইটিতে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

মানুষ হিসাবে সমস্ত মানুষেরই যে কতকগুলি সাধারণ সাদৃশ্য আছে এবং সেইদিক থেকে সকলে সমান এই ধারণাটি আদিম যুগ থেকে প্রচলিত। কিন্তু সেই আদিম ধারণা থেকে রাষ্ট্রে ও সমাজে সকল মানুষের সমান অধিকারের সিদ্ধান্তে পেঁছাতে এবং সেই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে।

সাম্যের ধারণার বিবর্তনের এই সুদীর্ঘ প্রতিক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন যুগে বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে, আবার এক বা প্রায় একরূপ থাকলেও আধেয়ের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনতম আদিম সমাজে সমান অধিকারের ধারণাটি প্রযুক্ত হত শুধু সমাজের সভ্যদের ক্ষেত্রে, নারী এবং দাসদের স্বভাবতই তার আওতার বাইরে রাখা হত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে সাম্যের কোন রূপের বদলে অসাম্যের নীতিরই ছিল প্রাধান্য। গ্রীক ও বর্বর, স্বাধীন মানুষ ও দাস, নাগরিক এবং অধীন ব্যক্তি, রোমান নাগরিক এবং রোমের প্রজা উভয়কে সমান মর্যাদা দানের কথা প্রাচীনদের কাছে বাতুলতা মনে হত। এই ভাবে সাম্যের আদর্শ তৎকালীন সমাজ-বাস্তবের দ্বারা সীমিত হয়েছিল।

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সামন্তযুগীয় শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলা এবং অ-সাম্যের বদলে সমস্ত মানুষের সমান অধিকারের দাবি অনিবার্যভাবে ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই সাম্যের দাবি লাভ করে এক সাধারণ চরিত্র। বিশেষ রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে সকল মানুষের অধিকার রূপে ঘোষণার দাবি ওঠে। এই ধারণাতে স্বভাবতই উদীয়মান বুর্জোআশ্রেণীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিবিম্বিত হয়েছে ও তার বাস্তব প্রয়োগ ঐ শ্রেণীর স্বার্থের দ্বারা সীমিত হয়েছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ভাবাদর্শ হিসাবে তা গ্রহণ করেছে এক ব্যাপক চরিত্র।

যে-মুহূর্তে বুর্জোআরা শ্রেণীগত সুবিধালোপের দাবি উত্থাপন করে, তার পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে সমস্ত শ্রেণীর বিলোপের দাবি ওঠে। প্রথমে তা আত্মপ্রকাশ করে ধর্মীয় আবরণে (উদীয়মান বুর্জোআশ্রেণীর জীবনদর্শনও প্রথমে ধর্মীয় আবরণেই অভিব্যক্ত হয়েছিল) এবং আদিম খ্রীষ্টধর্মের ধ্যানধারণার ভিত্তিতে। তারপরে তা বুর্জোআদের প্রচারিত সমান অধিকারের তত্ত্ব থেকে নিজ-দাবির সপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে। আরও পরে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব জীবনদর্শন সুনির্দিষ্ট রূপ নেওয়ার পরে সাম্যের দাবি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়। তার প্রাণবস্তু হল সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত রকমের শ্রেণী-শোষণের বিলোপ।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা বুর্জোআ মানবতাবাদের তথা সাম্যের ধারণার সীমিত চরিত্র ও দুর্বলতাকে বিশ্লেষণ করেছেন; যখন সেই ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণীর সাম্যের আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে তখন সে প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীনভাবে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু বুর্জোআ মানবতাবাদ ইতিহাসে বিশেষত মানুষের চিন্তার বিকাশে যে-ইতিবাচক ভূমিকা পূরণ করেছে তাকে স্বীকৃতি দানে তাঁরা কখনও কুণ্ঠিত হননি।

শ্রেণীভিত্তিক সমাজে প্রত্যেক যুগের ভাবাদর্শে শাসকশ্রেণীর জীবনদর্শনের পাশাপাশি শোষিতশ্রেণীগুলির জীবনদর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস সেগুলিকে অধ্যয়ন করেছেন সমাজবিকাশের ধারার পটভূমিতে এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অনুন্নত স্তরে শোষিতশ্রেণীর ভাবাদর্শে যে-দ্বৈতচরিত্র থাকে তা ঠিক বিশ্লেষণ করে ইতিবাচক দিকের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তার একটি দৃষ্টান্তের কথা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়ার দিকে উদ্ভূত 'ইউটোপিয়ান কমিউনিজম' সম্বন্ধে মার্কসের মন্তব্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আদিম খ্রীষ্টধর্মে[১] এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের কৃষক-বিদ্রোহের প্রতিফলনস্বরূপ উদ্ভূত মতবাদগুলি সম্বন্ধে এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ[২] তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতির উপর আলোকসম্পাত করে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শিক্ষা অনুসারে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবর্তিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজসৌধের (Superstructure) রূপান্তর ঘটে। তাই বলে কি পুরাতন সমাজের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সবকিছুই বাতিল হয়ে যায়? উৎপাদনের মাধ্যম ও অন্যান্য বস্তুগত উপাদান ও সম্পদ সম্পর্কে এ প্রশ্নের জবাব সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যেই পাওয়া যায়। বিতর্ক ওঠে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সম্পর্কে। সে-বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের মতামত ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রশ্নটির উপর আরো নতুন আলোকপাত করেন স্তালিন, ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে রচনাবলীতে। তিনি বলেন যে, সমাজের সাধারণ যোগসূত্র ও সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের কোন কোন অঙ্গ সমাজসৌধের অন্তর্ভুক্ত নয়। সমাজের ভিত্তি ও সৌধের পরিবর্তন হওয়ার ফলে ঐ সব অঙ্গের সাধারণ চরিত্র ও ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয় না, যথা ভাষা ও বিজ্ঞান। সুতরাং সেইসব ক্ষেত্রে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন খোঁজার চেষ্টা অ-বৈজ্ঞানিক এবং হাস্যকর হয়ে পড়ে।

সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ভাষার শ্রেণী-চরিত্র অর্থাৎ শ্রেণীভেদে ভাষাভেদের তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন। তাঁদের কঠোর

---

১ মার্কস-এঙ্গেলস, অন রিলিজিয়ন।

২ এঙ্গেলস, পেজ্যান্ট ওয়ার ইন জার্মানী।

সমালোচনা করে স্তালিন লেখেন যে ভাষার সঙ্গে সৌধের মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। ভাষা কোন বিশেষ সমাজের পুরাতন বা নতুন ভিত্তির সৃষ্টি নয়। ভাষা হল সমাজের ইতিহাসের সমগ্র ধারার এবং বহু শতাব্দীর ভিত্তিগুলির সৃষ্টি। তাকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করেনি, সৃষ্টি করেছে সমাজের সমস্ত শ্রেণী মিলে, বহু পুরুষ ধরে। তার উদ্ভব হয়েছে সমগ্র সমাজের, সমস্ত শ্রেণীর প্রয়োজন নির্বাহের তাগিদে এবং ভাষার সেই সামাজিক ভূমিকা হল সমাজের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষের মধ্যে যোগসূত্র অর্থাৎ ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম রূপে কাজ করা। সেইজন্যই ভাষা পুরাতন, মুমূর্ষু সমাজ-ব্যবস্থা এবং নতুন, উদীয়মান ব্যবস্থা, পুরাতন ও নতুন ভিত্তি, শোষক ও শোষিত উভয়েরই প্রয়োজন সমানভাবে পূরণ করে। ভাষা যদি তার এই সাধারণ চরিত্র ও ভূমিকা হারিয়ে ফেলে তবে ভাষা হিসাবে তার বিলুপ্তি অনিবার্য।

উক্ত প্রবন্ধাবলীতে স্তালিন বলেন যে, ভাষা ও তার অনুরূপ কয়েকটি সামাজিক প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে এক গুণগত স্তর থেকে অন্য গুণগত স্তরে উত্তরণ বিস্ফোরণের মাধ্যমে অর্থাৎ পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনের সৃষ্টি-মাধ্যমে হয় না, হয় ধীরে ধীরে। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সমাজ-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে। সমাজ-বিজ্ঞান সৌধের অঙ্গ। ভিত্তি ও সৌধের পরিবর্তনে সমাজ-বিজ্ঞানের চরিত্রে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানসমষ্টি, মানুষের চেতনায় প্রাকৃতিক-নিয়মের প্রতিফলন ইত্যাদি পুরাতন ও নতুন সমাজের প্রয়োজন সমানভাবে নির্বাহ করে—পুরাতন সমাজের ভিত্তি ও সৌধ ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এগুলি অকেজো হয়ে পড়ে না।

আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। মানব-চিন্তা-বিকাশের ইতিহাসের অতীত অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁরা ঐ প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিকভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। লেনিন বলেছেন যে, মানুষের চেতনায় প্রকৃতির নিয়ম তথা বাস্তবসত্তার প্রতিফলনের ব্যাপারটিকে দেখতে হবে বিকাশের একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া রূপে। বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত জ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে দ্বন্দ্বমূলকভাবে, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান অপরিবর্তনীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উদ্ভূত হয়েছে এরূপ ধারণার বদলে তার বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে অধ্যয়ন করতে হবে, দেখতে হবে যে, অসম্পূর্ণ এবং আংশিকভাবে সঠিক জ্ঞান কিভাবে ক্রমশ অধিকতর পূর্ণ ও সঠিকতর জ্ঞানের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে।[১]

১. লেনিন, মেটিরিয়্যালিজম অ্যান্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম।

ঐ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় বস্তুসত্তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে উলটোভাবে এবং কখনও বা বিকৃতভাবে। মানুষের জ্ঞান এগিয়ে চলেছে আপেক্ষিক সত্য এবং আপেক্ষিক ভুলের পরম্পরার মাধ্যমে। মানুষের চেতনায় বস্তুসত্তা কিভাবে বিমূর্তিকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উলটোভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে ভাববাদী দর্শনের 'অন্তরসত্তা', 'ভাবসত্তা', 'বিশ্ব-চেতনা' প্রভৃতি ধারণার জন্ম দিয়েছে সে-বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ধর্মীয় ধ্যানধারণার উৎপত্তি ও বিকাশের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। উপরিউক্ত ভ্রান্ত ধারণা ও তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল মূলত সেগুলির সামাজিক ভিত্তি অর্থাৎ শ্রেণী-ভেদ এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তার আদর্শগত হাতিয়ার। কিন্তু ঐ সংগ্রাম যে নিছক নেতি-বাচক নয় সে-কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

মার্কস বলেছেনঃ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার করণীয় হল প্রত্যেক সমাজের প্রকৃত উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সামাজিক-সম্বন্ধ সমষ্টির, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক, রাষ্ট্রগত কার্যকলাপ ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং চেতনার সমস্ত রূপ, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলিকে সমাজের সাহায্যে ব্যাখ্যা তথা তাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়া নির্ণয় করা। এইভাবেই সমাজবিকাশের প্রবাহ এবং তার বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি সামগ্রিকরূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।[১]

১. কার্ল মার্কস, জার্মান ইডিওলজি।

॥ ২ ॥

মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও শিল্পের কয়েকটি সমস্যা

জীবন ও জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও মার্কসীয় তত্ত্ব এগিয়ে চলে প্রয়োগ তথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। তত্ত্ব করে প্রয়োগের দিগন্ত-নির্দেশ, আবার প্রয়োগের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে, আলোকসম্পাত করে তার নতুন নতুন দিকের উপর। মার্কসীয় দর্শন বলে যে, মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য এবং আপেক্ষিক ভুলের পরম্পরার মধ্য দিয়ে পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে অর্জিত জ্ঞানের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন হয় যে, তার কোন্ অংশটুকু সঠিক এবং কোন্ অংশটুকু ভুল ; যেটুকু সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তার কতটুকু তৎসাময়িক আর কতটুকু তৎসাময়িকতার গন্ডীকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পাথেয় হিসাবে গ্রহণের উপযোগী। এইজন্যই বলা হয় যে, মার্কসবাদ কতকগুলি প্রাণহীন মন্ত্রের সমষ্টি নয়। তা কোন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে না বা কোন মহান নেতার কোন বক্তব্যকে পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন ভাবে ও আক্ষরিক অর্থে চিরকালের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করে না। মার্কসীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন কোন দেবতুল্য ব্যক্তির স্থান নেই যিনি কোনরকম ভুলের অতীত বা যাঁর রচনাবলীকে সমস্ত জ্ঞানের শেষ কথা বলে নির্বিচারে অন্ধ ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে। যাঁরা মার্কসীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রতিষ্ঠাতা এবং দিক-নির্দেশক সেই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন সব সময়েই মার্কসীয় সূত্রগুলিকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়ে গেছেন। তাঁরা সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা বা মূল্যায়নকে সৃজনশীল মার্কসবাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে নির্দেশ করেছেন। সাহিত্য ও শিল্প বা এককথায় নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদী আন্দোলনে এমন একটা সময় এসেছে ঐ সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার কাজটি হয় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, নতুবা তার অপব্যবহার করা হয়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে নানা ধরণের বিকৃতি, রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে বিচ্যুতি। কখনও মার্কসীয় মতবাদের বিপ্লবী শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়েছে, নতুন

পরিস্থিতিতে পুনর্বিচারের নামে পরীক্ষিত সূত্রগুলিকে 'সংশোধন' অর্থাৎ তার বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। আবার কখনও আত্মপ্রকাশ করেছে এক অত্যুগ্র অন্ধ অসহিষ্ণু সংকীর্ণতা যা তত্ত্বের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে তাকে অনড় অচল শাস্ত্রবাক্যে পর্যবসিত করতে চেয়েছে। প্রথম বিচ্যুতির প্রভাবে অনেক অ-মার্কসীয় 'বিজাতীয়' ধ্যানধারণা মার্কসবাদীদের চিন্তায় অনুপ্রবেশ করে। দ্বিতীয় বিচ্যুতির ফলে দেখা দেয় সূত্রগুলিকে স্থূল যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের প্রচেষ্টা, সৃজনশীলতার বদলে নৈরাজ্যবাদীসুলভ নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক মনোভাব।

যারা মার্কসবাদ-বিরোধী তারা এই ধরণের ঘটনা পুনঃপুনঃ ঘটতে দেখে উল্লসিত হয়। তারা বলার চেষ্টা করে যে, এটাই স্বাভাবিক। যাঁরা মার্কসবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথচ তার সঙ্গে সামগ্রিক পরিচিতির অভাবে যাঁদের প্রত্যয় দুর্বল, তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থার প্রতিকারের দায়িত্ব মার্কসবাদীদেরই এবং উপায়ও রয়েছে তাঁদের হাতে। সে উপায় হল সামগ্রিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সুস্থ ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে আলোচনা। বিতর্ক হওয়া স্বাভাবিক, এমন কি প্রয়োজনও বটে। কেন-না, সুস্থ বিতর্কের মাধ্যমে জীবনের বহুমুখী ও জটিল প্রবাহের উপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে তীব্র মতদ্বন্দ্ব যেমন একটা অসুস্থ অসংযমী বিতর্কের রূপ নিয়েছে ও বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে তার প্রতিফলন হয়েছে, বর্তমানে তার পাশাপাশি অনেক দেশে একটা সুস্থ যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়াসও দেখা যায়। নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকেও নতুনভাবে তার অঙ্গীভূত করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ও যৌথ আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশি হয়ে পড়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, এদেশে '৩০ দশকের শেষের এবং '৪০ দশকের গোড়ার দিকে মার্কসবাদীদের মধ্যে যৌথ আলোচনা ও অধ্যয়নের যে-অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টিতে ১৯৪৮-৫০এর সংকীর্ণতাবাদী ব্যাধির প্রকোপে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখা দেয় পরবর্তীযুগে তাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াস হয় নি। ফলে মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন, বিতর্ক, বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলির কোন সর্বসম্মত বা বহু মতের দ্বারা স্বীকৃত সংগঠিত উত্তর দেওয়ার কাজটি উপেক্ষিত হয়ে আছে। এই নৈরাজ্যের সুযোগে মার্কসবাদী লেখকদের মধ্যে অনেক অ-মার্কসবাদী বা 'বিজাতীয়' ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আজ আবার এক অংশের মধ্যে ১৯৪৮-এর যুগে বা তারও

পিছনে ফিরে যেয়ে মার্কসীয় সূত্রগুলির সংকীর্ণতাবাদী যান্ত্রিক ব্যাখ্যার চেষ্টা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরেও এমন কয়েকটি দল ও কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আছেন যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং তাকে কর্মের নির্দেশক রূপে গ্রহণ করেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে রয়েছেন বলেই এঁদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার কোন যুক্তি বা অধিকার নেই। সুতরাং এঁদের সঙ্গে আলোচনা ও চিন্তা-বিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। তৃতীয়ত, বর্তমানে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই অনুভব করেছেন যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। অবক্ষয়ী সামন্তযুগীয় ও পুঁজিবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের সাধারণ কর্তব্যটি এক বিশেষ জরুরী রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত অনেকে সংগ্রাম করে চলেছেন কিন্তু মিলিত প্রচেষ্টার শক্তি যে অনেক বেশি তা বলার দরকার করে না। এই মিলিত সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে মার্কসবাদীদেরই। কেন-না, প্রথমত তাঁদের হাতে রয়েছে পরীক্ষিত দিক-নির্দেশক যন্ত্র, দ্বিতীয়ত প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির আক্রমণ প্রধানত তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এবং ম্যাক্সিম গোর্কি ও আনাতোলি লুনাচারস্কীর রচনাবলীতে প্রকাশিত মতামতকে সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করলে মার্কসীয় নন্দন-তত্ত্বের কয়েকটি মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আরো অনেকে অবশ্য এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন তবে যাঁদের মতামত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত তাঁদের কথাই উল্লেখ করা হল।* ঐ সূত্রগুলি হ'ল ঃ

(১) শিল্পসৃষ্টির (শিল্প কথাটিকে এখন তার ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে) উৎস শিল্পীর নিছক ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী বা কোন রহস্যময় প্রেরণা নয়। বাস্তবজগত তথা সামাজিক পরিবেশ শিল্পী-মানসে যে-ভাবে প্রতিফলিত হয় তাকেই তিনি নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

(২) কোন শিল্পীই তাঁর সামাজিক এবং নিজস্ব শ্রেণী-পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না।

(৩) সমাজে পুরাতন ও নতুনের, প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির শক্তির দ্বন্দ্বে কোন শিল্পীই একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না।

* প্রবন্ধের আয়তনবৃদ্ধির ভয়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অপর দুটি মূল প্রশ্ন অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি মনোভাব, এই আলোচনার বাইরে রাখতে হচ্ছে। সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

এক কথায়, লুনাচারস্কীর ভাষায় বলা যেতে পারে যে, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের চর্চায় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই প্রধান উপাদান।

ঐ সূত্রগুলির প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত আরো অনেক বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন আছে সেগুলি নিয়েও পূর্বোক্তেরা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তবু সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যাঁরা মার্কসীয় দর্শন তথা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের পক্ষ থেকে সাধারণত কয়েকটি আপত্তি তোলা হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন যে, শিল্প-সৃষ্টিতে মন, ভাব এবং রসেরই প্রাধান্য অথচ বস্তুবাদী মার্কসীয়-তত্ত্বে এগুলির স্থান কোথায়? কিন্তু যাঁরা মার্কসবাদের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচিত তাঁরা জানেন যে, ঐ আপত্তিগুলি নিতান্তই অসার। কেন-না, মার্কসবাদ কখনও মানব-মনের বিরাট সৃজনশীল ভূমিকা এবং তার বহুমুখী অভিব্যক্তিকে অস্বীকার করে না। মার্কসবাদ যা করে তা হ'ল মন ও বস্তুসত্তার যথাযথ সম্বন্ধ নির্দেশ, আর ঐ দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন। তার মতে মানুষের মস্তিষ্ক ও মনন-প্রক্রিয়া হল বস্তুর দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ ও প্রবাহের শ্রেষ্ঠ ফল। তার উদ্ভবের পর থেকে 'মানুষের প্রচেষ্টা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা' (human strivings and will) ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল ভূমিকা পূরণ করে। অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব ও জীবনপ্রবাহ মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়ে ভাব, রস ও কল্পনার জন্ম দেয়। কল্পনার উৎপত্তি হয় চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু কল্পনা তার পরিবেশের গন্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়। গ্রীক রূপকথার চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন যে, উৎপাদিকা-শক্তি যখন অনেক পেছনে পড়েছিল তখন প্রকৃতির উপরে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ ঐসব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল (A critique of political Economy)। ম্যাক্সিম গোর্কীও লোককথার চরিত্র বিশ্লেষণে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন (Disintegration of personality-নামক প্রবন্ধে)।

মানুষের মনে বাস্তবের প্রতিফলন যে আয়নায় বা ক্যামেরায় প্রতিবিম্বের মত ব্যাপার নয় সে সম্বন্ধেও মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তারা বহু আলোচনা করেছেন। মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মাও-সে-তুং 'On Practice' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা করেন। মার্কস এক জায়গায় বলেছেন যে, শিল্প হ'ল বস্তুসত্তাকে সৃষ্টিমূলক ভাবে জানার প্রক্রিয়া (Art is the creative cognition of reality).

উপরোক্ত সূত্রকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের বিরুদ্ধে, বিশেষত ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে অর্থনীতির সরাসরি প্রতিফলন খোঁজার চেষ্টার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস কয়েকটি

চিঠিতে এবং লেনিন তাঁর Philosophical Note-book-এ যথেষ্ট হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। ম্যাক্সিম গোর্কী থেকে শুরু করে যে-সব মার্কসবাদী-শিল্পীর সৃষ্টি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকৃতির অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে তাঁরা যান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তত্ত্বের সফল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তবু একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সাধারণভাবে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে মন, হৃদয়বৃত্তি, রস, কল্পনা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেন একটা কুণ্ঠা, এমন কি বিরূপ মনোভাব, দেখা যায়। অনেকদিন আগে বারবুশের সঙ্গে বিতর্কের সময় রোঁমা রোঁলা মন্তব্য করেছিলেন যে, মনো-জগতের উল্লেখ করা মাত্রই মার্কসবাদীরা যেন তার মধ্যে বুর্জোআ ধারণা ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার গন্ধ আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি-মানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সংঘাত ইত্যাদি ও শিল্পে তার রূপায়ণের বিষয় নিয়ে এ-যাবৎ মার্কসবাদীদের মধ্যে বিশদ আলোচনা ও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হয় নি। হয়তো বুর্জোআ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং 'শিল্পের জন্য শিল্প'-তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে সামাজিক জীব বলে প্রতিপন্ন করার প্রতি প্রথম দিকে স্বভাবতই বেশী মনোযোগ দিতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিফলন-তত্ত্বকে যান্ত্রিক এবং একপেশে ভাবে উপস্থিত করায় অনেক বিকৃতি ঘটেছে। পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। কিন্তু যাঁরা এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁদের কাছে শুনে একটা কথা মনে হয়েছে। পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব সামাজিক-পটভূমিতে ব্যক্তি-মানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সাহিত্যে-শিল্পে তার প্রতিফলনের প্রক্রিয়া অধ্যয়নের পক্ষে এক নতুন দিগন্ত নির্দেশ করেছে। তাছাড়া বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের এবং তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের বিশ্লেষণ ও সাহিত্যের উপাদান সম্বন্ধে গোর্কী-লুনাচারস্কির বক্তব্য, সুষ্ঠু আলোচনার পক্ষে দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে রেখেছে। মোটকথা, শিল্পে রসসৃষ্টি বা শিল্পকে রসোত্তীর্ণ করার সম্বন্ধে মার্কসবাদীরা কোন বিরূপ বা উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেন, 'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।'

সে বক্তব্যের সঙ্গে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের কোন মৌলিক বিরোধ নেই।

বরং মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ঐ বক্তব্যকে তার সঠিক সামাজিক পটভূমিতে উপস্থাপন করে এবং তার সামনে পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে।

দ্বিতীয় অর্থাৎ শিল্পীর উপরে তাঁর সামাজিক ও বিশেষভাবে শ্রেণী-পরিবেশের প্রভাবের সূত্রটিরও বিভিন্ন সময়ে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন শিল্পীর শিল্পকৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিচারের অর্থ কখনই এই নয় যে জ্যামিতিক নিয়মের মত সহজ সরলভাবে তাঁদের সামন্তযুগীয় বা বুর্জোআ বা পাতি-বুর্জোআশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করতে হবে। এইরূপ চিহ্নিত-করণের প্রয়াসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে ঐ-সব শিল্পীদের কৃতি সম্বন্ধে নৈরাজ্যবাদীসুলভ বর্জনের মনোভাব। সেই মনোভাবই আরো একটু বেশি অগ্রসর হয়ে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই নস্যাৎ করে দিতে চায়। মার্কসবাদী আন্দোলনের প্রথম যুগে, বিশেষত রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পরে ঐ ধরণের মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। লেনিন সেই মনোভাবের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কখনও স্বয়ম্ভূর মত শূন্য থেকে আবির্ভূত হতে পারে না। মানবতার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করে এবং তার পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে।

পুনর্মূল্যায়নের কথাটির দ্বিবিধ তাৎপর্য আছে। সাংস্কৃতিক উত্তরাধি-কারকে যেমন নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি নির্বিচারে বর্জনের প্রশ্নও ওঠে না। বিশেষ শিল্পী ও তাঁর শিল্পকৃতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সঠিক নীতি থেকে বিচ্যুত হলে যে-সব বিকৃতি দেখা দেয় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিপর্যয় ঘটে তার পরিচয় পাওয়া গেছে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ১৯৪৮-৫০-এর সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির যুগে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সম্প্রতি চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে যে-ধরণের কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাকে মার্কসবাদের নিদারুণ বিকৃতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এই ধরণের মনোভাব ও আচরণকে লেনিন 'সাংস্কৃতিক নৈতিবাদ' (Cultural Nihilism) বলে অভিহিত করেছিলেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে মাও-সে-তুং স্বয়ং অতীতে যে-সব সূত্র নির্দেশ করেছিলেন আজ তাঁরই নেতৃত্বে সেইসব কিছুকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তাদের মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন শিল্পীর কৃতির সামাজিক শ্রেণীবিচার আদৌ জ্যামিতিক সূত্রের মত সহজ নয়। বলাবাহুল্য যে, এখানে রাজনৈতিক নিবন্ধ বা সুস্পষ্টভাবে প্রচারমূলক রচনার কথা বলা হচ্ছে না। সকল শিল্পসৃষ্টির বিচারে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন বা মতামতের প্রশ্ন বড় নয়। সেখানে বিচার করে দেখতে হয় যে, সমাজ-সত্য,

সামাজিক সংঘাত ইত্যাদি কি-ভাবে তাঁর কৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এঙ্গেলস একটি চিঠিতে বলেন যে, শিল্পী তাঁর ভাবাদর্শ সম্বন্ধে কদাচিৎ সচেতন থাকেন। শুধু শিল্পীদের বেলায়ই নয়, কোন শ্রেণীর ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের সম্বন্ধেও তিনি একথা বলেছেন। তাঁরা সচেতনভাবে কাজ করেন 'বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তু'র সম্বন্ধে। তাঁদের জীবনদৃষ্টি মূলত সামাজিক তথা শ্রেণী-পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় ঠিকই, তবে সে প্রভাব কাজ করে পরোক্ষভাবে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, অস্পষ্ট সামাজিক প্রবণতা, ব্যক্তিগত রুচি, নৈতিক অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মিলিত প্রতিক্রিয়া শিল্পী-মানসে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেক শিল্পীর শিল্পকৃতিতে তাঁর পরিপার্শ্বের সামাজিক সংঘাত এবং একাধিক শ্রেণী-মানসের অভিব্যক্তি দেখা যায়। শিল্পীর নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ ভাবাদর্শ ও সৃষ্টির তাগিদে অগ্রগমনের আগ্রহ, এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব শিল্পকর্মে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনুভূতির গভীরতা, দৃষ্টির ব্যাপকতা তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে নিজ শ্রেণীর দৃষ্টি-ভঙ্গীর গণ্ডী অতিক্রম করায়। বিশেষত মহৎ শিল্পীদের সৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। সামগ্রিক বিচার তথা মূল্যায়নের মাধ্যমেই তাঁর কৃতির ভূমিকা সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয়। বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের এবং তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। আমাদের দেশে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় এঙ্গেলস ও লেনিনের উল্লিখিত মতামত বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে। তাই এখানে পুনরুল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় সূত্রটি অর্থাৎ শিল্পীর 'নিরপেক্ষতা' বা 'পক্ষ অবলম্বনের' প্রশ্নটিই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, আর বর্তমানে মার্কসবাদীদের মধ্যে এই সূত্রের সঠিক তাৎপর্য সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলছে। লেনিন উপরোক্ত সূত্রটিকে একটি তীক্ষ্ণরূপ দেন ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের যুগে, 'Party Organisation and party Literature' নামক প্রবন্ধে। বিপ্লবের সময় যে-সব বুদ্ধিজীবী 'নিরপেক্ষতা' এবং স্বাধীনতার বুলির আড়ালে শাসক-শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাঁদের সেই ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই লেনিনের আক্রমণ মূলত পরিচালিত হয়েছিল। তিনি ঐ প্রবন্ধে বলেন যে, সমাজে বাস করে তার উর্ধ্বে থাকা যায় না এবং তীব্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিবেশে শিল্পীকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এক পক্ষ বেছে নিতেই হয়। তাই তিনি শিল্পের 'পার্টিজান' বা দলীয়-চরিত্রের কথা তুলে ধরে সমস্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান।

যাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প'-তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং যাঁরা শিল্পীর স্বাধীনতার অজুহাতে সামাজিক দ্বন্দ্বের সত্যকে এড়িয়ে চলতে চান তাঁরা যে লেনিনের উক্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি তুলবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এঁদের আপত্তি সম্বন্ধে আলোচনার এখানে বিশেষ প্রয়োজনও নেই। কেন-না ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় বার বার দেখা গেছে যে, এঁরা যতই 'নিরপেক্ষ' থাকার চেষ্টা করুন না কেন, সামাজিক সংকট বা দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির সময়ে এঁদের অধিকাংশই নিজের জানিতে বা অজানিতে প্রতিবিপ্লবের শিবিরে যেয়ে পেঁাছান। কিন্তু যে-সব শিল্পী সামাজিক প্রগতিতে বিশ্বাস করেন, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা যাঁদের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে এসে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে, তাঁদের মনেও শিল্পের 'পার্টিজান'-চরিত্রের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ও সংশয় আছে। এই সব প্রশ্ন ও সংশয় খুব বড় হয়ে ওঠে যখন মার্কসবাদীরা সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পার্টিজান-শিল্পকে পার্টি-শিল্প বা পার্টি-নিয়ন্ত্রিত শিল্প বলে চালাবার চেষ্টা করেন। যাঁরা মার্কসবাদী নন তাঁদের মনে ত প্রশ্ন ছিলই। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিপূজার যুগের ক্ষতিকর অভিজ্ঞতা এবং চীনে তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নমুনা দেখে মার্কসবাদীদের মনেও বহু প্রশ্নের উদয় হয়েছে।

প্রশ্নগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, পার্টিজান হওয়ার অর্থ কি? শিল্পীকে কি বাধ্যতামূলকভাবে পার্টি-সদস্য হতে হবে অথবা পার্টির নির্দেশ নির্বিচারে মেনে চলতে হবে? দ্বিতীয়ত, শিল্পে পার্টি-নিয়ন্ত্রণের অর্থ কি? পার্টির ফরমাইস অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করতে হবে? পার্টি-নিয়ন্ত্রণের অর্থ যদি আরো ব্যাপকভাবে ধরা যায় অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের বদলে নেতৃত্ব সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা যায় তাহলেও প্রশ্ন থাকে। নেতৃত্ব অর্থে বোঝায় যে, পার্টির কাজ হবে শিল্পের ভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ এবং শিল্প ও শ্রেণী-সংগ্রামের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলির উপর আলোকপাত করা। সেক্ষেত্রেও কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, পার্টি-নেতৃত্ব যে সবসময় ঠিক নির্দেশ দেবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, পার্টি-নেতৃত্ব অনেকসময় শুধু ভুলই নয়, মারাত্মক ভুল করে থাকেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি কোথায়? তাছাড়া আর একটি প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। শিল্পসৃষ্টির সামাজিক উৎস ও ভূমিকা স্বীকার করলেও সৃষ্টির কাজটি ত হয়ে থাকে ব্যক্তিমানসের মাধ্যমে। সুতরাং শিল্পীর কি কোন স্বাধীনতাই থাকবে না, বা থাকলে তার সীমানা কিভাবে নির্দিষ্ট হবে?

কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবে এইসব প্রশ্নে খুব যান্ত্রিক এবং একপেশে

মনোভাব অবলম্বনের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। তার মূলে, অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মার্কসবাদের শিক্ষার সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাব। শৈশবের ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার পর প্রায় সমস্ত দেশেই মার্কসবাদীরা এই বিষয়ে সুস্থ, পরিণত, সামগ্রিক বিচারধারার ভিত্তিগুলি রচনা করেন। তার ফলে অ-মার্কসবাদী প্রগতিশীল শিল্পীদের সঙ্গে চিন্তা-বিনিময় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। কিন্তু আবার যখন সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির ব্যাধি সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে তখন ঐসব ভ্রান্ত যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই মাথা তুলেছে। লেনিনের একটি উক্তিকে পটভূমি-বিচ্ছিন্ন ভাবে উদ্ধৃত করে সংকীর্ণতাবাদীরা বলার চেষ্টা করেন যে, 'যারা আমাদের পক্ষে নয় তারা আমাদের শত্রু'। বলাবাহুল্য যে এই মনোভাব শুধু যে শৈশবে ফিরে যাওয়ার বিকৃত ঝোঁককে প্রকাশ করে তাই নয়, তা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতারও পরিচায়ক। কেন-না ঐ মনোভাবের যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি হল, যাঁরাই পার্টির বাইরে আছেন বা কোন-না-কোন ব্যাপারে পার্টির বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন তাঁদের সবাইকে শত্রু-শিবিরে ঠেলে দেওয়া।

মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তারা কখনও ঐরূপ বিভ্রান্তির অবকাশ দেননি। ১৮৪৮ সালের পরবর্তী-সময়ে মার্কস-এঙ্গেলস যথাক্রমে হাইনে ও ফিলিগ্রাথের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে Neue Rheinische Zeitung পত্রিকায় সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা বলেন, যে-শিল্পী সর্বহারা এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছেন তিনিই পার্টিজান। ১৮৬০ সালে ফিলিগ্রাথকে লেখা একটি চিঠিতে মন্তব্য করেন যে, যিনি নিজেকে সাম্যবাদের সপক্ষে বলে ঘোষণা করেছেন তাঁকেই 'দলীয়' লেখক বলা হবে। তিনি কমিউনিস্ট লীগের সভ্য না হয়েও 'দলীয়' বলে স্বীকৃতি পেতে পারেন।

১৯০৫ সালে লেনিন যখন আবার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন তখন তিনি প্রধানত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আতিশয্য এবং 'শিল্পীর নিরপেক্ষতা,' 'স্বাধীনতা' ইত্যাদির অজুহাতে সংগ্রামী দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে রুশের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এমন একটি মত আত্মপ্রকাশ করছিল যে, সমাজতন্ত্রবাদ এবং অবক্ষয়বাদ এই দুইয়ের ভিতর সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব। এইরূপ ধারণার মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য তার কঠোর সমালোচনায় লেনিন প্রবৃত্ত হন। লেনিন উল্লিখিত প্রবন্ধে 'পার্টি' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে, শিল্পকে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের অংশীদার হতে হবে, সমাজবাদী গণতন্ত্রের অভিযানে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন দিক-নির্দেশক হতে হবে। সেই সঙ্গেই তিনি সাহিত্য-শিল্পের যান্ত্রিক বর্গীকরণের বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী

উচ্চারণ করেন এবং বলেন যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুকূলে সংখ্যাল্পের মত বিসর্জন দেওয়ার নীতি অচল। তিনি ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রচেষ্টা বা পছন্দ-অপছন্দকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা, বিষয়-বস্তু নির্বাচন বা তার প্রকাশভঙ্গীর স্বাধীনতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

লেনিন সৃজনশীল রচনায় ভাবের প্রাধান্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তিনি গোর্কীর ভুল-ত্রুটিকে যেমন অনেক সময় সমালোচনা করেছেন তেমনি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অবাধ সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বারবারই বলেছেন যে, গোর্কীর ব্যক্তিগত বাস্তবদৃষ্টি পার্টির পক্ষে অমূল্য সম্পদ। মোট কথা, তিনি চেয়েছিলেন যে, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সমাজ-সচেতন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হোক এবং শিল্পী শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করুক।*

স্তালিন এক সময়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের 'মানব-মনের ইঞ্জিনীয়ার' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টি কর্তৃক হুকুমজারী-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সে বক্তব্য বিশ্বের প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করেছিল। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে ম্যাকসিম গোর্কী পার্টি-নেতৃত্বের অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নৈতিক দিক থেকে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বলেন। তিনি লেখকদের প্রতিভার বহুমুখিতার সঙ্গে-সঙ্গে যৌথ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন যে, সোভিয়েট সাহিত্যকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ও যৌথসত্তারূপে সংগঠিত হতে হবে। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন যে, ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে খর্ব করার প্রশ্ন ওঠে না বরং তাকে অবাধ বিকাশের সর্বোত্তম সুযোগ দিতে হবে।

ঐ দুই বক্তব্যের ভিতরে বস্তুত কোন মৌলিক বিরোধ নেই। মার্কসীয় দর্শন ব্যক্তিত্বকে বা ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করে না, দুইয়ের ভিতর সঠিক সম্বন্ধ তথা সামঞ্জস্য স্থাপন করে। তবে অগ্রগতির প্রত্যেক স্তরে ঐ তত্ত্বগত নীতি প্রয়োগের নতুন-নতুন সামঞ্জস্য দেখা দেয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যৌথসত্তা ও শিল্পীর স্বাধীনতা, পার্টি-নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার মত শিল্পীর স্বাধীনতা আপেক্ষিক হতে বাধ্য তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিল্পের অগ্রগতি ও পরিণতির

* Science & Society পত্রিকায় (Vol. XXIX No. 1) প্রকাশিত 'Lenin as a Literary Theorist' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই আপেক্ষিক স্বাধীনতার সীমা সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা স্বাভাবিক। অন্যদিকে পার্টি-নেতৃত্ব সাফল্যের সঙ্গে নিজস্ব ভূমিকা পূরণ করতে পারে পরিবর্তনশীল বস্তুস্থিতির বিশ্লেষণ, তার মূল দিক-নির্ণয় ও শিল্পে রূপায়ণের নতুন-নতুন সমস্যার উপরে আলোকপাত করে। এজন্য পারস্পরিক আলোচনা ও চিন্তা-বিনিময় প্রয়োজন। প্রয়োজন নতুনভাবে সমন্বয়-সাধন।

সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে যোগদানের পর বামপন্থী জার্মান লেখক এর্ণস্ত তোলের (Ernst Toller) বলেছিলেন যে, বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট মানসিক স্বাধীনতার উপর যে-সব বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন তা ক্রমশ শিথিল করে নেওয়া হচ্ছে। ঐ কংগ্রেসে সরকারী প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, লেখকদের নিজের পছন্দমত লেখার স্বাধীনতা আছে তবে খারাপভাবে লেখার স্বাধীনতা নেই। তোলের আরো বলেন যে কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নন এমন অনেক লেখক বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন শুধু এই কারণে যে, তাঁরা মহৎ শিল্পী। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রুশিয়ায় লেখকদের কাছে চাটুকারসুলভ স্তুতির জন্য দাবী করা হয় না, বরং আত্ম-সমালোচনা অভিনন্দিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিপূজার ব্যাধি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন শিল্প-সাহিত্য নিষ্ফলতার চোরাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম যুগে আবার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায়। তখন পার্টি-নেতৃত্বকে অস্বীকার করার এবং মার্কসীয় তত্ত্বের মূলসূত্রগুলিকে পরিহাস করার ঝোঁক একদল তরুণ সাহিত্যিক ও শিল্পীর মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে। সেই সুযোগে পাশ্চাত্ত্যের অবক্ষয়ী শিল্পের প্রভাবও কিছু পরিমাণে অনুপ্রবেশ করে। আন্তর্জাতিক মতদ্বন্দ্বে যাঁরা সোভিয়েত-বিরোধীপক্ষ তাঁরা উক্ত ঘটনার তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখেন। আসলে ঐ ঘটনার মূলে ছিল নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে সমন্বয় সাধনের সমস্যা।

১৯৬৫ সালে রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখকদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোচনা হয়। উক্ত যুক্তরাষ্ট্রের লেখক-সংঘের সভাপতি লিওনিদ সোবোলেভ তাঁর রিপোর্টে অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে লেখকদের নিজেদেরই একটি Quality Inspection Department গঠন করতে হবে। সাহিত্যের দলীয়-চরিত্র সম্বন্ধে লেনিনীয় তত্ত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, মতাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা প্রচার করা মানে মার্কস-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তরুণ লেখকদের কতকগুলি বিচ্যুতি ও উন্নাসিক মনোভাবের অভিব্যক্তির কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন

যে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তরুণেরা যখন কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তারা দেখে যে, বাস্তবজীবন অনেক জটিল। অনেক সময় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অপ্রত্যাশিত বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। তখন সে বিদ্রোহ করে বা হতাশ হয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে। তারপর অবশ্য বাস্তবকে বুঝতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ শান্ত হয়ে আসে। এদের সামনে সমস্যার সমাধান তুলে ধরাই হ'ল সাহিত্যের কাজ। কিন্তু একদল লেখক সমাধান-নির্দেশের বদলে এদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের নেতিবাচক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ তরুণদের একটি ক্ষুদ্র অংশের নৈতিক চরিত্রে, কতকগুলি বিশেষ কারণের যোগাযোগে যে কতকগুলি অবাঞ্ছিত প্রভাবের যথা সংশয়বাদ, নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের মনোভাব, জীবনে লক্ষ্যের অভাব ইত্যাদির অনুপ্রবেশ হয়েছে তাকেই সাহিত্যের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন। ঐসব লেখকের কঠোর সমালোচনা করা হলেও রিপোর্টে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সাহিত্যের লেনিনীয় তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত সৃজনশীল উদ্যোগ, শৈল্পিক উৎকর্ষ, শিল্প-রীতি ও সৃজনশীল প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যকে বিকাশের যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া হবে।

ব্যক্তিপূজার যুগে সোভিয়েত-সাহিত্য একধরণের একপেশেমির ব্যাধিতে ভুগছিল। তার উপরে অনেক বিষয়ের আলোচনা সম্বন্ধে নানা বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল এবং বাস্তবসত্যকে সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে আবার আর এক ধরণের একপেশেমি দেখা দেয়, যথা—সোভিয়েত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলিকে (যার চিত্রণ আগে নিষিদ্ধ ছিল) অতিরঞ্জিত করে দেখানো, নৈরাজ্যবাদীসুলভ প্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু লেখকদের উক্ত সম্মেলনের আলোচনা থেকে মনে হয় যে উক্ত উভয় ধরণের একপেশেমি পরিহার করে সমগ্র সত্যের রূপায়ণকেই তাঁরা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সব চেয়ে আশার কথা এই যে, তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৬ সালে সুবিখ্যাত 'শত পুষ্প বিকাশের' নীতি ঘোষণা করে। সঠিক ভাবে বলতে গেলে ঐ নীতির সারমর্ম ছিল 'শত পুষ্প বিকশিত হোক এবং বিভিন্ন ধরনের চিন্তার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলুক।'

'On the correct handling of contradictions among the people' নামক প্রবন্ধে মাও-সে-তুং বলেন যে, শত পুষ্পের বিকাশ এবং শত চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিযোগিতার নীতির উদ্দেশ্য হল শিল্পের বিকাশ এবং বিজ্ঞানের

অগ্রগতিকে উৎসাহদান। শিল্পে বিভিন্ন রীতি অবাধে বিকাশলাভ এবং বিজ্ঞানে বিভিন্ন চিন্তা স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে। যদি তার বদলে বিশেষ এক ধরণের রীতি ও ধারাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার জোরে চাপিয়ে দেওয়া এবং অন্যগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয় তবে তা শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্ মতটি সঠিক আর কোন্‌টি ভুল তা সংশ্লিষ্ট মহলে স্বাধীন আলোচনা এবং ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে স্থির হওয়া উচিত। সরাসরি ভাবে তা স্থির করা যায় না। কোন্ জিনিস সঠিক কিংবা বেঠিক তা নির্ণয় করার জন্য একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় দরকার। অতীতে দেখা গেছে যে, নতুন এবং সঠিক মত গোড়ার দিকে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বীকৃতিলাভ করতে পারে নি, তাকে সংগ্রামের নানা মোড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। অনেক সঠিক এবং ভাল জিনিসকে প্রথম প্রথম সুগন্ধ পুষ্পের বদলে বিষাক্ত উদ্ভিদ বলে গণ্য করা হয়েছে। সৌরজগত সম্বন্ধে কোপারনিকাসের এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ডারউইনের তত্ত্বকে একসময়ে ভ্রান্ত বলে বর্জন করা হয়েছিল। ফলে তাদের কঠিন বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করতে হয়েছে।

ঐ প্রবন্ধেই মাও-সে-তুং আরো বলেন যে, মতাদর্শগত সংগ্রাম ঠিক অন্যধরণের সংগ্রামের মত নয়। এই সংগ্রামে স্থূল ও জবরদস্তি-মূলক পদ্ধতির বদলে সহিষ্ণু, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। যারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিবিপ্লবী তাদের বাক্-স্বাধীনতা হরণ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যে-সব মতাদর্শগত প্রশ্ন বা মানুষের অন্তর-জীবন-সংক্রান্ত প্রশ্ন রয়েছে সেগুলি স্থূল ও জবরদস্তিমূলক উপায়ে দমনের চেষ্টা শুধু নিরর্থকই নয়, ক্ষতিকর। কেন-না ভ্রান্ত ধারণার প্রকাশ নিষিদ্ধ করলেও তা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে যাবে। অন্যদিকে সঠিক ধারণাকে যদি সংগ্রামের সুযোগ না দিয়ে উষ্ণ-ঘরে লালনপালন করা হয় তাহলে তার জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই শুধুমাত্র আলোচনা, সমালোচনা ও যুক্তির সাহায্যে সঠিক ধারণার বিকাশ এবং ভ্রান্ত ধারণার পরাজয় ঘটানো সম্ভব। বর্তমানে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে যে-ধরণের কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে মাও-সে-তুংয়ের উক্ত বক্তব্যের সঙ্গতি কোথায় ?

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বছর দুইয়ের মধ্যেই উক্ত উদার নীতিকে প্রত্যাহার করে নেয়। সম্প্রতি তার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলা হচ্ছে যে, ঐ উদারতার সুযোগে বুর্জোআ প্রতিক্রিয়াশীলেরা পার্টি ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল। কিন্তু এই কৈফিয়তের জবাবে খুব সঙ্গতভাবেই একটা প্রশ্ন করা যায়। পুঁজিবাদী দেশের মার্কসবাদীরা নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, সমস্ত

রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তাঁরা সে কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করেও চলেছেন। তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকূল পরিবেশে, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাকে প্রকাশ্য বিতর্কের দ্বারা পরাজিত করা যাবে না কেন ?

মোট কথা, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি হ'ল তার বিজ্ঞান-সম্মত শিল্পদৃষ্টি, বিচারপদ্ধতি এবং সৃজনশীল কর্ম। এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তার অগ্রগতির পথ উদ্ভাসিত হয় সত্যনিষ্ঠ আত্মসমীক্ষার আলোকে।

॥ ৩ ॥

লেনিনের শিল্প-চিন্তা

লেনিনের শিল্প-চিন্তার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা নানা প্রবন্ধে। এর মধ্যে যে-গুলি এ-পর্যন্ত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে অবলম্বন করেই তাঁর শিল্প-চিন্তার একটা রূপরেখা যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছি। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতে যে-সব বিষয়ে লেনিনকে মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায় সেগুলিকে ভাগ করা চলে প্রধানত দুইটি ভাগে, যথা (১) শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে শিল্পের তথা শিল্পীর ভূমিকা এবং তাকে সচেতনভাবে কাজে লাগাবার প্রশ্ন (২) শৈল্পিক তথা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সম্বন্ধে মনোভাব—এই প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো মহান শিল্পীর সৃষ্টি এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামগ্রিক উত্তরাধিকার দুটিকেই বিচারের পদ্ধতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

লেনিনের মতামত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে শিল্পের সামাজিক চরিত্র তথা ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসীয় সূত্রগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখের প্রয়োজন আছে মনে করি। কেননা লেনিনের রচনায় ঐ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না থাকলেও ঐ সূত্রগুলিই যে তাঁর শিল্প-চিন্তার পটভূমি তাতে সন্দেহ নেই। উক্ত সূত্রগুলি হল ঃ

(১) শিল্প-সৃষ্টির উৎস শিল্পীর নিছক ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী বা কোনো রহস্যে ঢাকা প্রেরণা নয়। বাস্তব জগৎ তথা সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিবেশ শিল্পী-মানসে যে-ভাবে প্রতিবিম্বিত হয় তাকেই তিনি নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

(২) কোন শিল্পীই তাঁর সামাজিক এবং নিজস্ব শ্রেণী-পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না।

(৩) সমাজে পুরাতন ও নতুনের তথা প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বে কোন শিল্পীই একেবারে নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারেন না।

ঐ সূত্রগুলিকে মার্কসবাদ-বিরোধীরা অপব্যাখ্যা করে থাকে। যাঁরা সচেতন ভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী নন অথচ যাঁদের মার্কসীয় চিন্তা তথা পদ্ধতির সঙ্গেও বিশদ পরিচিতি নেই তাঁদের মনেও এ সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তি দেখা যায়। আবার মার্কসবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকে সূত্রগুলিকে নিতান্ত যান্ত্রিক

ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের চেষ্টার দ্বারা ঐ সব অপব্যাখ্যা এবং বিভ্রান্তির সুযোগ দান করেন। তাই সূত্রগুলির নিছক উল্লেখে সীমিত না থেকে আরো দুই একটি কথা বলে নেওয়া নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্যক্তিমানসে সমাজ-বাস্তবের প্রতিফলন ঠিক দর্পণে প্রতিবিম্ব বা ক্যামেরায় তোলা আলোকচিত্রের মত নয়। সে প্রক্রিয়া সাধিত হয় সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ, চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাদি যে মানস-পরিমণ্ডল রচনা করে তার মাধ্যমে। এর সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রবণতা, বস্তুনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির প্রভাবের কথাও মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তারা উল্লেখ করেছেন।

মার্কস বলেছেন যে, শিল্প হল বস্তুসত্তাকে সৃজনাত্মকভাবে জানা। শিল্প-সৃষ্টিতে মন, ভাব ও রসের প্রাধান্য। শিল্পের চরিত্র ও উৎস সামাজিক এবং শিল্পের প্রভাবও সামাজিক। দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র হল শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা শিল্পী-মানস। শিল্প সম্বন্ধে মার্কসীয় সূত্র এই তিনের পারস্পরিক ও নিবিড় যোগসূত্রের কথাই পাদপ্রদীপের আলোকে তুলে ধরে। শিল্পসৃষ্টির পক্ষে বস্তুসত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান, রসবোধ ও কল্পনা ইত্যাদি যে-সব উপাদানের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন, সেগুলির যথাযথ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মার্কস বলেছেন যে, অসীম বৈচিত্র্যে-ভরা বিশ্ব ও জীবনপ্রবাহ মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়ে ভাব, রস ও কল্পনার জন্ম দেয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কল্পনার উৎপত্তি হয় জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু কল্পনা তার পরিবেশের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে অগ্রসর হয়। ভাববাদীরা কল্পলোককে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে। মার্কসবাদী কল্পলোক ও বাস্তবের প্রকৃত সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা করে।

মার্কস-এঙ্গেলসের মতামত পর্যালোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে, শিল্পী-মানসে বা তাঁর সৃষ্টিতে শ্রেণী-পরিবেশের প্রতিফলন তথা প্রভাবের বিষয়টিকে তাঁরা আদৌ জ্যামিতির সূত্রের মতো ছকে-বাঁধা রূপে দেখেননি। এঙ্গেলস একটি চিঠিতে বলেন যে, শিল্পী বা ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিরা কদাচিৎ ভাবাদর্শের সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। তাঁরা সচেতনভাবে কাজ করেন 'বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তু'র মাধ্যমে। তাঁদের জীবনদৃষ্টি মূলত নিজস্ব শ্রেণী-পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় ঠিকই, তবে তা কাজ করে পরোক্ষভাবে। অনেক মহৎশিল্পীর কৃতিত্বে পারিপার্শ্বিক সামাজিক সংঘাত এবং একাধিক শ্রেণীর চিন্তা ও মনোভাবের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন হতে দেখা যায়। শিল্পীর নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ একদিকে ভাবাদর্শ ও শ্রেণী-পরিবেশের প্রভাব এবং অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠ ও সৃষ্টির তাগিদে এগিয়ে চলার আগ্রহ—এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তাঁর শিল্পকর্মে

পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্বে যিনি জয়ী হন তিনি নিজ-শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর গন্ডী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেন।

ভূমিকা না বাড়িয়ে এবার সরাসরি লেনিনের মতামত আলোচনা শুরু করা যাক। শিল্পের চরিত্র ও ভূমিকা যখন সামাজিক অর্থাৎ তা দ্বন্দ্বময় সমাজ-জীবনপ্রবাহের প্রতিবিম্ব ও অঙ্গ তখন নতুন সমাজ-রচনার সংগ্রামে সেই অঙ্গকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই সামনে এসে দাঁড়ায়। লেনিন সমাজ-সচেতন শিল্পীদের কথা মনে রেখেই লিখেছেন যে, তাদের কাজ হল সহজ-সরল এবং সুপরিচিত তথ্যের ভিত্তিতে পাঠকের মনে গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নের প্রগাঢ় আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, সহজ যুক্তি ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে তার সামনে মূল সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরা ও তার মনে নতুন নতুন প্রশ্ন জাগানো। সমাজ-সচেতন শিল্পী কখনও ধরে নেন না যে, তাঁর পাঠক চিন্তা করে না বা চিন্তা করতে চায় না। বরং তিনি এই অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হন যে, অপরিণত পাঠক নিজের মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে উৎসুক এবং তিনি তাকে সেই কঠিন কর্মে সহায়তা দান করছেন, তাকে প্রথম পদক্ষেপগুলি গ্রহণে ও তারপর স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে শিক্ষা দিচ্ছেন। (সংগৃহীত রচনাবলী, ৫ম খণ্ড)।

লেনিনের উপরিউক্ত বক্তব্যই আরো বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ১৯০৫ সালে লেখা 'পার্টি সংগঠন ও পার্টিসাহিত্য' নামে প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে 'পার্টিজান সাহিত্য'-এর তত্ত্ব নামে খ্যাত। লেনিনের উক্ত বক্তব্যকে পটভূমি-বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরে তার নানা অপব্যাখ্যা হয়েছে। এক্ষেত্রেও একদিকে মার্কসবাদ-বিরোধীরা যেমন সচেতনভাবে অপব্যাখ্যা করেছে, তেমনি অন্যদিকে মার্কসবাদীদের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে লেনিনীয় সূত্রের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রকাশিত লেনিনের মতামত সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধটি লিখিত হয় ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে। তখন প্রথম রুশ বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের সামনে জারতন্ত্রকে বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে পিছু হটতে এবং জনগণের কিছু কিছু দাবি আংশিকভাবে মেনে নিতে হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে সেন্সর-প্রথা তুলে দেওয়া হয়। সেন্সর-প্রথা প্রচলিত থাকাকালে রুশিয়ার সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যেরা যেমন গোপন পত্রিকা প্রকাশ করত তেমনি বৈধ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রচারের যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় তাকেও কাজে লাগাত। স্বভাবতই বৈধ পত্র-পত্রিকায় লেখার সময় লিখতে হত আইন বাঁচিয়ে এবং তার ফলে বক্তব্যে খানিকটা অস্পষ্টতা থাকত। সেন্সর-প্রথা রহিত হওয়ার পর প্রশ্ন দাঁড়াল যে, খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশের

সুযোগকে পার্টি তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী কি-ভাবে কাজে লাগাবে?

এর উত্তরে লেনিন প্রথম সূত্র নির্দেশ করে বলেন যে, বুর্জোআসুলভ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা, 'অভিজাত নৈরাজ্যবাদী' মনোভাব ও মুনাফার লালসা, মুনাফার জন্য পত্রিকা চালনা ইত্যাদি-নীতির ঠিক বিপরীত পন্থা নিতে হবে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে। তাদের কর্তব্য হবে 'পার্টিসাহিত্য'-এর নীতি তুলে ধরা, বিকশিত এবং যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা।

'পার্টিসাহিত্য'-এর নীতিটি কি? উক্ত প্রবন্ধে লেনিন নিজেই ঐ প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দান করেন। তিনি বলেন যে, ঐ নীতির অর্থ নিম্নরূপ: সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রমিকশ্রেণীর নিকটে সাহিত্য কখনই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পকেট ভারী করার উপায় রূপে বিবেচিত বা শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন প্রচেষ্টা হতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, নিরপেক্ষ (নন-পার্টিজান) লেখক বা সাহিত্যিক অতি-মানব আমরা চাই না। সাহিত্যকে পরিণত হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ লক্ষ্যের তথা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি-সচেতন অগ্রগামী অংশের দ্বারা পরিচালিত সামগ্রিক আন্দোলনের সংগঠিত, পরিকল্পিত ও অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে।

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এখানে লেনিন সাধারণভাবে শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টির প্রশ্ন বা ঢালাওভাবে শিল্পী-সাহিত্যিকমাত্রেরই ভূমিকার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি তুলে ধরেছেন সাহিত্যকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত কার্যকলাপের অঙ্গ হিসাবে কাজে লাগাবার প্রশ্নটিকে।

এই প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে, 'নিরপেক্ষ লেখক' বলতে লেনিন যে-কথাটি ব্যবহার করেছেন তার ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'নন পার্টিজান'। কথাটি লক্ষণীয় এই কারণে যে, 'পার্টিজান সাহিত্য'-এর কথা উঠলেই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, শিল্পী বা সাহিত্যিককে কি বাধ্যতামূলকভাবে পার্টির সদস্য হতে হবে? লেনিনের 'নন-পার্টি' শব্দের বদলে 'নন-পার্টিজান' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে যে-তাৎপর্য আছে বলে বলার চেষ্টা করেছি তাকে আপাতদৃষ্টিতে চুলচেরা বিতর্ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'পার্টিজান সাহিত্য' বলতে মার্কস-এঙ্গেলস যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার পটভূমিতে দেখলে উক্ত পার্থক্যের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৪৮ সালে যথাক্রমে হাইনে ও ফিলিগ্রাথের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে Neue Rheirische Zeitung পত্রিকায় মার্কস-এঙ্গেলস বলেন, যে-শিল্পী সর্বহারা এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছেন তিনিই 'পার্টিজান'। ১৮৬০ সালে ফিলিগ্রাথের

নিকটে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস আরো স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেন যে, যিনি নিজেকে সাম্যবাদের সপক্ষে বলে ঘোষণা করেছেন তাঁকেই 'পার্টিজান' বলা হবে এবং তিনি কমিউনিস্ট-লীগের সভ্য না হয়েও 'দলীয়' বলে স্বীকৃতি পেতে পারেন। লেনিন নিজে এই প্রবন্ধে অন্যত্র যেখানে যেখানে 'পার্টিসাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করেছেন তা করেছেন ব্যাপক অর্থে।

'পার্টিজান সাহিত্য' প্রসঙ্গে আর এক ধরণের অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও সংশয়ের দেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেকে বলে থাকেন যে, 'পার্টিজান সাহিত্য' মানেই পার্টি-নিয়ন্ত্রিত ফরমান-অনুযায়ী রচিত সাহিত্য তথা শিল্প। কিন্তু এই সম্পর্কে লেনিন যে-সব অভিমত উক্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন তার পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় ঐ ধরণের অপব্যাখ্যা, বিকৃতি বা সংশয় নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণার উপরে গড়ে উঠেছে।

লেনিন পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে, শিল্পে ও সাহিত্যে যান্ত্রিকতা, সব কিছুরই একই ধরণে বর্গীকরণ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা অচল। এই ক্ষেত্রটিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তির অভিরুচি, চিন্তা ও কল্পরূপ (Fantasy), আঙ্গিক ও আধেয় ইত্যাদিকে যে অনেক বেশী সুযোগ দিতে হবে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সাহিত্য-শিল্পক্ষেত্রের কার্যকলাপকে অন্যান্য বিভাগের কার্যকলাপের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে এক করে দেখা যেতে পারে না।

অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্নটির অপর দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, উপরিউক্ত বক্তব্যের দ্বারা 'পার্টিজান সাহিত্য'-এর তত্ত্ব নাকচ হয়ে যায় না। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠিত শ্রমিক-আন্দোলনকে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখতে, তার উপর তত্ত্বাবধান করতে এবং তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন্ত লক্ষ্যের প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চারিত করায় মনোযোগী হতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে ঐ দুটি বক্তব্যকে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে, বিশেষত যাঁরা শিল্পের সামাজিক চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কিত মার্কসীয় সূত্রের সম্বন্ধে অবহিত নন, তাঁদের কাছে। তাছাড়া, উপরিউক্ত দুটি বক্তব্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-মূলক সম্বন্ধ রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন না থাকলে মার্কসবাদীদের দিক থেকেও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু লেনিনের পরবর্তী বক্তব্য অনুধাবন করলে আমরা তাঁর চিন্তার মূল সুরটি বুঝতে সমর্থ হই।

তিনি বলেন যে, সাহিত্যকর্মে এই রূপান্তর-সাধনের কাজটি রাতারাতি সম্ভব নয়। বর্গীকৃত ব্যবস্থা, ফরমান-জারি বা বাঁধাধরা ছকের সাহায্যে সমস্যার সমাধান এই ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। যা প্রয়োজন তা হল এই যে,

আমাদের গোটা পার্টিকে তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ রাজনীতি-সচেতন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে এই নতুন সমস্যাটি সম্বন্ধে অবহিত হতে, সেটিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে এবং তার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে।

'পার্টিজান সাহিত্য'-এর তত্ত্বটি শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করেছে। তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে যে নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, সে সত্যটি লেনিনের দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তাই তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন যে, আমরা এক নতুন ও কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু এটি একটি মহান ও সুন্দর কর্তব্য—সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত একটি ব্যাপক, বহুমুখী ও বিচিত্র সাহিত্য গড়ে তোলা।

লেনিন ভাবী 'পার্টিজান সাহিত্য'কে 'স্বাধীন সাহিত্য' বলে অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত উপরিউক্ত সমস্যা এবং শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক চরিত্রের প্রশ্নের উপর আলোকসম্পাত করে।

প্রথমত, অনপেক্ষ স্বাধীনতার বুলির সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এটা বুর্জোআ অথবা নৈরাজ্যবাদী বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজে বাস করে সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, 'পার্টিসাহিত্য' হবে সত্যকার স্বাধীন সাহিত্য এই কারণে যে, সামন্ততান্ত্রিক সেন্সর-প্রথার কবলমুক্ত হওয়ার পর তা বুর্জোআ-দোকানদারী সাহিত্য-সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যবসায়বুদ্ধির জালে ধরা দেবে না। তা হবে সত্যকার স্বাধীন সাহিত্য এই কারণে যে, তার দলে নতুন নতুন শক্তি যোগ দেবে সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সহানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে। শ্রমজীবী জনগণই হল দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, প্রাণশক্তি এবং ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। তাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করবে পার্টি-সাহিত্য। তা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত কার্যকলাপকে মানবতার বৈপ্লবিক চিন্তার সর্বশেষ অবদানের দ্বারা সমৃদ্ধ করবে। অতীত অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের আদিম ও কাল্পনিক (ইউটোপিআন) রূপগুলি থেকে বিকাশের প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বর্তমান সংগ্রামের স্থায়ী পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে তার কাজ। এইজন্যই তা হবে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সাহিত্য।

'পার্টিজান'-শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা নিজেদের অন্তরের তাগিদে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী বাহিনীতে যোগ দেবেন এবং সৃষ্টি করবেন সেই সংগ্রামের আদর্শ ও অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণায়। লেনিন এই কথাটিই বলতে চেয়েছেন।

শৈল্পিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মূল্যায়ন-পদ্ধতি সম্পর্কে লেনিনের চিন্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় যথাক্রমে লিও তলস্তয় এবং হেরজেন সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে। মহৎশিল্পীর সামাজিক ও শ্রেণীপরিবেশ, শিল্পী-মানস ও তাঁর সৃষ্টি ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ককে অতিসরলীকৃত যান্ত্রিক ছকের বদলে কি-ভাবে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে বিচার করতে হবে উক্ত প্রবন্ধগুলিতে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অভিব্যক্ত হয়েছে।

১৯০৫ সালে যখন রুশিআর জনগণ জার-স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু করে তখন তলস্তয় তার নিন্দাবাদ করেছিলেন। তবু ১৯০৮ সালে তলস্তয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত একটি প্রবন্ধে লেনিন তলস্তয়কে 'রুশ-বিপ্লবের দর্পণ' বলে অভিহিত করেন। সেখানে তিনি লেখেন, মহান শিল্পী যে-বিপ্লবকে বুঝতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছেন এবং যার থেকে স্পষ্টতই দূরে সরে রয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখাটা প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিপ্লবটি অত্যন্ত জটিল জিনিস। যে-জনগণ এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে এমন বহু সামাজিক উপাদান রয়েছে যারা ঘটনাবলীর তাৎপর্য অথবা বিপ্লবের দ্বারা উপস্থাপিত ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। তেমনি আমাদের মধ্যে যদি কোন মহৎশিল্পী থাকেন তবে তিনি নিজ-কৃতিতে বিপ্লবের অন্তত কয়েকটি মৌলিক দিক নিশ্চয়ই প্রতিফলিত করেছেন। তলস্তয়ের মতামতে অভিব্যক্ত পরস্পরবিরোধী দিক, অর্থাৎ প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান উভয়েরই চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, এই স্ব-বিরোধিতার উৎস খুঁজতে হবে তাঁর সমকালীন রুশিআর সমাজ-জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে। তলস্তয় ছিলেন অভিজাত ভূ-স্বামী-সম্প্রদায়ের মানুষ, তবুও তাঁর শিল্পকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রুশিআর কৃষক-বুর্জোআ বিপ্লবের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি—বলিষ্ঠ ও দুর্বল উভয় দিক, অগ্রগমনের আকাঙ্ক্ষা এবং অতীতের পিছুটান দুটিই। এই অর্থেই তাঁকে বিপ্লবের দর্পণ আখ্যা দেওয়া হয়। লেনিন বলেন যে, রুশিআর আসন্ন বুর্জোআ-বিপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ রুশীয় কৃষকদের মধ্যে যে-ভাবধারা ও অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই প্রবক্তা হিসাবে তলস্তয় মহান।

১৯১০ সালে তলস্তয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা প্রবন্ধটিতে লেনিন বলেন যে, তলস্তয় তাঁর অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পর-পর কতকগুলি মহান-কৃতিতে ১৮৬১ সালের পরবর্তীকালের অর্ধ-ভূমিদাসপ্রথার প্রভাবাধীন পুরাতন, প্রাক্-বিপ্লব-যুগের রুশিআর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনেকগুলি বিরাট

সমস্যা উত্থাপন ও শৈল্পিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। ভূমিদাসদের মালিকদের দ্বারা নিপীড়িত একটি দেশে বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগটি তলস্তয়ের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতের ফলে সমগ্র মানবতার শৈল্পিক বিকাশে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে। লেনিনের মতে, তলস্তয়ের অভিমতের স্ব-বিরোধিতাগুলি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধিতা নয়। ভূমিদাসপ্রথার সংস্কারোত্তর প্রাক্-বিপ্লব রুশীয়-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মনস্তত্ত্ব যে-সব জটিল ও পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতি, সামাজিক প্রভাব এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিল তারই প্রতিফলন হয়েছে তলস্তয়ের শিল্পকর্মে। তিনি ভূমিদাস-প্রথার এবং সরকারী নির্যাতন ও ধর্মযাজকদের প্রতারণার বিরুদ্ধে কৃষকদের মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, অভিযোগ ও প্রতিবাদকে বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত করেছেন ; আবার সেই সঙ্গেই দেখা যায় যে, রুশিআর আসন্ন সংকটের কারণ বুঝতে এবং তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রবন্ধে উপসংহারে লেনিন বলেন যে, তলস্তয় যে-উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে এমন বহু জিনিস আছে যা অতীতের নিদর্শন নয়, ভাবী-কালের সম্পদ। রুশিআর শ্রমিকশ্রেণী তলস্তয়ের উত্তরাধিকারের দুর্বল দিকগুলিকে বর্জন এবং ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ করে শোষণমুক্ত নতুন সমাজগঠনের সংগ্রামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মহৎশিল্পী বা চিন্তাবিদের মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্ব-বিরোধিতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে অগ্রগমন তথা পিছুটান কাটিয়ে, চিন্তার উন্নত স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে কি-ভাবে তাঁর সমকালীন সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে হবে সেই পদ্ধতির একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই 'হেরজেন স্মরণে' নামক লেনিনের প্রবন্ধটিতে।

তিনি লেখেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হেরজেনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ এবং রুশ বিপ্লবের প্রস্তুতিতে মহান ভূমিকা পালন করেছিলেন যে-লেখক, ইতিহাসে তাঁর যথার্থ স্থান-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

হেরজেনের চিন্তার মধ্যে বিপ্লবী ও উদারনৈতিক দুটি দিকই ছিল। লেনিন সে দুটিকে পৃথক করে দেখান। হেরজেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ নয়। তাঁর মধ্যে আবেগপ্রবণতা ও শুভেচ্ছা-পূর্ণ কল্পনার অনেক চিহ্ন দেখা যায়। তবু লেনিনের মতে, তা ছিল সেই সময়ের বুর্জোআ গণতন্ত্রীদের বিপ্লবী-চরিত্রের অভিব্যক্তি। শুধু বুর্জোআ গণতন্ত্রীদেরই নয়, তখন পর্যন্ত বুর্জোআ গণতন্ত্রীদের প্রভাবমুক্ত হতে

পারেনি যে-শ্রমিকশ্রেণী তাদেরও বিপ্লবী-চরিত্রের প্রতিফলন হয়েছে হেরজেনের চিন্তাধারায়।

হেরজেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদে পৌঁছাতে পারেননি। সেটাই ছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবগুলির পরাজয়ের পর তাঁর আত্মিক বিপর্যয়ের কারণ। লেনিন বলেন যে, ১৮৪৮ সালের পর হেরজেনের মনে যে গভীর সংশয়বাদ ও হতাশা প্রবল হয়ে ওঠে তা ছিল আসলে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বুর্জোআ অধ্যাসের (illusions) বিপর্যয়। বিশ্ব-ইতিহাসের যে-যুগে ইওরোপে বুর্জোআ গণতন্ত্রীদের বৈপ্লবিক-চরিত্র বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে অথচ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক-চরিত্র তখনও পরিণতি লাভ করেনি—এমনি এক যুগসন্ধির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় হেরজেনের মনোজগতের নাটকে।

হেরজেন তাঁর সংশয়বাদ ও নৈরাশ্য অতিক্রম করতে সমর্থ হন। লেনিন বলেছেন যে, রুশিআর উদারনৈতিকদের পক্ষে সংশয়বাদ ছিল গণতন্ত্র থেকে উদারনৈতিকতায় উত্তরণের রূপ। হেরজেনের বেলায় ঠিক বিপরীত। হেরজেনের বেলায় তা ছিল 'শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত' বুর্জোআ গণতন্ত্রের অধ্যাস থেকে শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর, ক্ষমাহীন ও অপরাজেয় শ্রেণী-দ্বন্দ্বে উত্তরণের রূপ। ১৮৬৯ সালে বাকুনিনের নিকট লিখিত হেরজেনের পত্রাবলীতে এই সত্যটিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায়। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লেনিন লেখেন যে, হেরজেনের স্মৃতি-উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রমিকশ্রেণী তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করছে বিপ্লবী-তত্ত্বের মহান ভূমিকার শিক্ষা, তারা আরো শিক্ষা গ্রহণ করছে যে, বীজ বপন ও ফসল কাটার মধ্যে অনেকগুলি দশকের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও বিপ্লবের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এবং জনগণের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার কখনই নিষ্ফল হয় না।

অতীতের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে লেনিনের মনোভাবকে প্রকাশ করা যায় একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রতিজ্ঞার সাহায্যে ঃ (১) শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি রচনার জন্য মানবতার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন, (২) সেই জ্ঞানভান্ডার তথা উত্তরাধিকারকে শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথরে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যায়ন করে নিতে হবে।

লেনিন বলেছেন যে, মানবজাতির দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারা নিজের মনকে সমৃদ্ধ করলে তবেই কমিউনিস্ট হতে পারা যাবে। (নির্বাচিত রচনাবলী, ৩য় খন্ড)।

১৯২০ সালে 'যুব-লীগের কর্তব্য' প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মানবসমাজ

এ-যাবৎ যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়কে মার্কস সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। মানুষের চিন্তাপ্রসূত সমস্ত কিছুকে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমালোচনা, পুনর্বিবেচনা ও যাচাই করে দেখেন। এইভাবে তিনি এমন-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হন যা বুর্জোআ দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা বা সংস্কারের দরুণ পূর্বসূরীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

মানবতার বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ ও তার রূপান্তরসাধন ছাড়াও প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গঠন যে সম্ভব নয়, এই সূত্রটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে তিনি উক্ত বক্তৃতায় বলেন: প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কোনো অজানা দুনিয়া থেকে হঠাৎ উদ্ভূত হয়নি এবং তা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে প্রচার করে এমন লোকদের আবিষ্কার নয়। পুঁজিবাদী সমাজ, ভূস্বামী সমাজ ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের জোয়ালে বদ্ধ অবস্থায় মানবতা যে-জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে তারই যুক্তিসঙ্গত বিকাশের ফল হতে হবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে।

এই প্রশ্নে কি-মনোভাব নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে যাতে সংশয় তথা বিতর্কের অবকাশ না থাকে সেজন্য লেনিন ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি'-শীর্ষক একটি খসড়া-প্রস্তাব রচনা করেন। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও উক্ত প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত করছি: 'মার্কসবাদ যে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শরূপে বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, তা বুর্জোআ যুগের সবচেয়ে মূল্যবান কৃতিগুলিকে বর্জন করা দূরে থাকুক বরং মানব-চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়ায় দু'হাজারেরও বেশী বছর সময় ধরে সঞ্চিত প্রত্যেকটি মূল্যবান উপাদানকে আয়ত্ত এবং নতুন রূপদান করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উপরিউক্ত ভিত্তিতে এবং ঐদিকে আরো বেশী অগ্রগতি হলে তবেই শুধু তাকে খাঁটি প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিকাশ-রূপে স্বীকার করা যেতে পারে।'

উত্তরজীবনে লেনিন বিপ্লবোত্তর রুশিআয় নতুন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি রচনা সম্বন্ধে যে-প্রতিজ্ঞাটিকে সূত্রায়িত করেন তার উন্মেষের দেখা পাওয়া যায় আরো আগে। ১৯০৮ সালে ম্যাক্সিম গোর্কীকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি বলেন যে, কোন শিল্পী সব ধরণের দর্শন থেকেই তার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি গোর্কীকে উদ্দেশ্য করে ঐ চিঠিতেই বলেন: 'লেখনশিল্প সম্বন্ধে যে আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং আপনার মতামত, আপনার শৈল্পিক অভিজ্ঞতা ও দর্শন, এমন-কি ভাববাদী-দর্শন থেকেও গ্রহণ

করে এমনসব সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারে যা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পক্ষে খুবই উপযোগী হবে—সে বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

শিল্পীকে সৃষ্টির স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে লেনিন কি মনোভাব পোষণ করতেন তা উপরের চিঠিটি থেকে বোঝা যায়।

লেনিনের শিল্প-বিষয়ক অভিমত সম্বন্ধে লুনাচারস্কীর একটি প্রবন্ধে খুব মূল্যবান তথ্য পরিবেষিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে 'প্রলেটকাল্ট' নামে সংগঠনের পক্ষ থেকে আলেকজান্দ্রিস্কি থিয়েটারের উপর প্রবল আক্রমণ পরিচালিত হয় ও থিয়েটারটিকে 'প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পের দুষ্ট উৎস' আখ্যা দেওয়া হয়। লুনাচারস্কী ঐ বিষয় নিয়ে লেনিনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে: 'উক্ত থিয়েটারে এখনও পুরাতন সঙ্গীত ও নাটক ইত্যাদি অভিনীত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এখনও আমরা তার বিকল্প কিছু পাইনি। যুগোপযোগী পরিবর্তন শীগগিরই দেখা দেবে আশা করি, কিন্তু হঠাৎ অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে নতুনের বিকাশ করতে গেলে সংস্কৃতির সূত্রে ছেদ পড়বে। এটা আশা করা যায়, বিপ্লবের বিজয়ের পর যে-নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি হবে তা হবে প্রলেতারীয় এবং সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু তাই বলে পুরাতন সঙ্গীত-বিদ্যালয়-গুলিকে বন্ধ করে দেওয়া বা পুরাতন 'ফিউডাল-বুর্জোআ' বাদ্যযন্ত্র ও স্বরলিপি পুড়িয়ে ফেলার কথা কল্পনা করতে পারি না।'

উত্তরে লেনিন বলেন যে, লুনাচারস্কীর অনুসৃত নীতিই সঠিক। তবে তিনি অর্থাৎ লুনাচারস্কী যেন বিপ্লবের প্রভাবে জন্ম নিচ্ছে যে-সব নতুন উপাদান তাকে সমর্থন-দানের কথাও মনে রাখেন। সে-নতুন প্রথম দিকে হয়তো দুর্বল হবে কিন্তু তাকে নিছক নন্দনতাত্ত্বিক মাপকাঠিতে বিচার করা ঠিক হবে না। তাহলে পুরাতন ও পরিপক্ক শিল্প নতুনের বিকাশকে ব্যাহত করবে। পুরাতন শিল্প নিজে থেকেই পরিবর্তিত হবে ঠিকই কিন্তু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতার তাড়না শিথিল হলে উক্ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হবে শ্লথ।

আলোচনার শেষে লুনাচারস্কী নীতিটির সারমর্ম নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করেন:

'পুরাতন শিল্পে যা-কিছু অল্পবিস্তর মূল্যবান তাকে সুরক্ষিত করতে হবে। শিল্পকে—মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বস্তুর কথা বলছি না—রঙ্গমঞ্চ, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি জনমনে-প্রভাববিস্তারকারী-শিল্পকে প্রভাবিত করতে হবে, তবে স্থূলভাবে নয়। নতুন চাহিদার উপযোগীভাবে তার বিকাশের প্রক্রিয়াকে যত দ্রুত সম্ভব সম্পূর্ণ করতে সাহায্য দিতে হবে। শিল্প-ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতাগুলির প্রতি অবলম্বন করতে হবে বাছাই করে নেওয়ার মনোভাব।

তাদের আগ্রাসনের দ্বারা ক্ষেত্র দখল করতে দেওয়া হবে না, কিন্তু যথার্থ শৈল্পিক উৎকর্ষের মাধ্যমে খ্যাতিলাভের সুযোগ ও সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে।'

লেনিন বলেন, লুনাচারস্কীর বক্তব্যে সঠিকভাবেই নীতি উপস্থাপিত হয়েছে।

(মস্কো প্রলেট পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'লেনিন অন লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট' নামক বইটি দ্রষ্টব্য।)

ক্লারা জেতকিন 'লেনিনের স্মৃতি' নামে বইটিতে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্ত শিল্পের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে লেনিনের মতামতের যে-বিবরণ দিয়েছেন তার সারাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার উপসংহার করাই যুক্তিযুক্ত হবে ঃ

'শিল্প জনগণের জিনিস। তার শিকড়গুলি যেন শ্রমজীবী-জনগণের জীবনের গভীরে প্রোথিত হয়। জনগণ যেন তাকে বোঝে ও ভালবাসে। তার কর্তব্য জনগণের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ এবং উন্নীত করা। তা যেন জনগণের শিল্পবোধ তথা শৈল্পিক সহজ-প্রবৃত্তিকে (instincts) সক্রিয় ও বিকশিত করে তোলে।'

॥ ৪ ॥

তলস্তয় সম্পর্কে লেনিন

(লিও তলস্তয়—রুশ-বিপ্লবের দর্পণ)

মহান শিল্পী যে-বিপ্লবকে বুঝতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছেন এবং যে-বিপ্লব থেকে তিনি স্পষ্টতই দূরে সরে রয়েছেন তার সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখাটা প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও কৃত্রিম মনে হতে পারে। যে-দর্পণ জিনিসকে সঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত করে না তাকে সঠিক অর্থে দর্পণ আখ্যা দেওয়া চলে না। কিন্তু আমাদের বিপ্লবটি অত্যন্ত জটিল জিনিস। যে-জনগণ এই বিপ্লব সংঘটন ও তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে এমন বহু সামাজিক উপাদান রয়েছে যারা স্পষ্টতই যা ঘটছে তার তাৎপর্য বোঝেনি এবং ঘটনাপ্রবাহ তাদের সামনে যে-সব প্রকৃত ঐতিহাসিক কর্তব্য উপস্থিত করেছে তা থেকে দূরে সরে রয়েছে। আমাদের সামনে যদি কোন সত্যকার মহৎশিল্পী থাকেন তবে তিনি নিজ-কৃতিতে বিপ্লবের অন্তত কয়েকটি মৌলিক দিক নিশ্চয়ই প্রতিফলিত করেছেন।

বৈধ রুশীয় সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠা যদিও তলস্তয়ের অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও মন্তব্যে পরিপূর্ণ, তবুও তা রুশ-বিপ্লবের চরিত্র এবং চালিকাশক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তলস্তয়ের রচনাবলীর বিশ্লেষণে আদৌ আগ্রহী নয়। সমস্ত সংবাদপত্রই ন্যক্কারজনক ভণ্ডামীতে ভরা। দুই ধরণের ভণ্ডামী—সরকারী এবং উদারনৈতিক। প্রথমটি হল ভাড়াটে লেখকদের উৎকট ভণ্ডামী, সেই লেখকদের মাত্র কিছুকাল আগে তলস্তয়ের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আজকে তাদের আদেশ করা হয়েছে তলস্তয়কে একজন দেশপ্রেমিক বলে চিত্রিত করতে হবে ও ইউরোপের দৃষ্টির সামনে শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতে হবে। এইসব ভাড়াটে লেখকদের যে তাদের একঘেয়ে রচনার জন্য মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে সে কথা সকলেই জানে, তাই তারা কাউকে ধোঁকা দিতে সমর্থ হবে না। কিন্তু অনেক বেশি মার্জিত এবং সেইজন্যই অনেক বেশি ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হল উদারনৈতিক ভণ্ডামী। 'রেক' পত্রিকার ক্যাডেট বালালাইকা-বাদকদের আলাপ শুনলে মনে হবে যে, তলস্তয়ের জন্য তাদের সহানুভূতি অত্যন্ত গভীর এবং পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু 'মহান ঈশ্বর-সন্ধানী'র সম্বন্ধে তাদের বাগাড়ম্বর আগাগোড়া মিথ্যায় ভরা, কেন-না কোনো

রুশীয় উদারনীতিবাদীই তলস্তয়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস বা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তলস্তয়ের সমালোচনার প্রতি সহানুভূতিপোষণ করে না। সে চায় নিজের রাজনৈতিক পুঁজি বাড়াবার উদ্দেশ্যে একটি জনপ্রিয় নামের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে, দেশব্যাপী বিরোধী-শক্তিগুলির নেতারূপে নিজেকে জাহির করতে; সে চায় আবোলতাবোল বকুনির ডামাডোলের সাহায্যে একটি প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর পাবার দাবীকে ধামাচাপা দিতে। সে প্রশ্নটি হল: 'তলস্তয়বাদে'র প্রকট স্ব-বিরোধিতাগুলির কারণ কি এবং সেগুলির মাধ্যমে আমাদের বিপ্লবের কোন্ ত্রুটি ও দুর্বলতা ফুটে উঠেছে?

তলস্তয়ের রচনাবলীতে, মতামতে, মতবাদে এবং তাঁর প্রবর্তিত চিন্তাধারায় বিরোধগুলি খুবই প্রকট। একদিকে আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই এমন একজন মহৎশিল্পী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিকে যিনি শুধু রুশীয় জীবনের অতুলনীয় চিত্রই অংকন করেননি, বিশ্ব-সাহিত্যে দিয়েছেন প্রথমশ্রেণীর অবদান। অন্যদিকে দেখি খ্রীষ্টের চিন্তায় আচ্ছন্ন একজন ভূস্বামীকে। একদিকে সামাজিক মিথ্যাচার ও ভন্ডামীর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে বলিষ্ঠ, স্পষ্টভাষী আন্তরিক প্রতিবাদ এবং অন্যদিকে 'তলস্তয়বাদী' অর্থাৎ রুশীয় বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত অবসাদ ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত একজন বিলাপকারী, যে প্রকাশ্যে বুক চাপড়ে বিলাপ করে, 'আমি খারাপ দুষ্ট প্রকৃতির লোক কিন্তু আমি নৈতিক আত্মশুদ্ধির সাধনা করছি; আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে চালের কাটলেট খাওয়া ধরেছি।' একদিকে দেখতে পাই পুঁজিবাদী শোষণের ক্ষমাহীন সমালোচনা, সরকারী নির্যাতন, আদালত ও রাষ্ট্র-প্রশাসনের মুখোশ উন্মোচন, সম্পদ ও সভ্যতার অবদানগুলির বিকাশের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে দারিদ্র্য, অবনতি ও দুঃখকষ্টবৃদ্ধির মৌল-বিরোধের স্বরূপ-উদ্ঘাটন; অন্যদিকে বশ্যতার মতবাদ প্রচার, হিংসার সাহায্যে 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না-করার' উপদেশ। একদিকে অত্যন্ত সংযত বাস্তববাদ, ছোট ও বড় সমস্তরকমের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা; অন্যদিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘৃণ্য জিনিস অর্থাৎ ধর্মের প্রচার, সরকারের দ্বারা নিযুক্ত যাজকদের বদলে অন্যধরণের যাজকদের প্রতিষ্ঠা করা, তারা জনগণের সেবা করবে নৈতিক প্রত্যয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে অর্থাৎ যাজক-তন্ত্রের সবচেয়ে মার্জিত এবং ঠিক সেই কারণে সবচেয়ে ঘৃণ্য রূপটির উৎকর্ষ সাধন করবে।

তলস্তয় যে সম্ভবত ঐ-সব বিরোধের দরুণই শ্রমিক-আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে তার ভূমিকা অথবা রুশ-বিপ্লব কোনোটিকেই বুঝতে সমর্থ হননি সে-কথা বলাবাহুল্য। কিন্তু তলস্তয়ের মতামত ও মতবাদের বিরোধগুলি আকস্মিক ব্যাপার নয়, সেগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ

তৃতীয় অংশের রুশীয় জীবনের বিরোধাত্মক অবস্থাই প্রতিফলিত হয়েছে। তখন ভূমিদাসপ্রথার কবল থেকে সদ্যমুক্ত গ্রামাঞ্চলকে পুরোপুরি অর্থে পুঁজিপতি ও ট্যাক্স-আদায়কারীদের অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষক-অর্থনীতি ও কৃষক-জীবন যে-সব সুপ্রাচীন বনিয়াদের উপর বহু শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়েছিল সেগুলিকে অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। তাই তলস্তয়ের মতামতের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলিকে আজকের দিনের শ্রমিক-আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে চলবে না (এইধরণের বিচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, তবে তা যথেষ্ট নয়); সেগুলিকে বিচার করতে হবে অগ্রগমনশীল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, জমি থেকে উৎখাত জনগণকে সর্বস্বান্ত-করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। রুশিয়ার পিতৃসত্তাক-গ্রামাঞ্চলের বুক চিরে উঠেছিল সেই প্রতিবাদ। মানবতার মুক্তির এক নতুন টোটকা দাওয়াইয়ের আবিষ্কারক মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে তলস্তয় নিতান্ত উদ্ভট। ঠিক সেই কারণেই, যে-সব বিদেশী ও রুশীয় ‘তলস্তয়বাদী’ তাঁর মতবাদের দুর্বল-তম দিকগুলিকে মন্ত্রবাক্যে পরিণত করতে সচেষ্ট তাদের কথা আলোচনার এতটুকু প্রয়োজন নেই। রুশিয়ার আসন্ন বুর্জোয়া-বিপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ রুশীয় কৃষকদের মধ্যে যে-সব ভাবধারা ও অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই প্রবক্তা হিসাবে তলস্তয় মহান। তাঁর মতামতের সমষ্টিকে সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁর মধ্যে কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব হিসাবে আমাদের বিপ্লবের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তিনি মৌলিক। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে তলস্তয়ের মতামতের স্ব-বিরোধগুলিকে প্রকৃতপক্ষে দর্পণ বলা চলে অর্থাৎ আমাদের বিপ্লবে কৃষকদের যে-পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্যে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পূরণ করতে হয়েছিল—তার দর্পণ। একদিকে বহু শতাব্দীর সামন্তযুগীয় শোষণ এবং সংস্কারোত্তর কয়েক দশকে অতি দ্রুতগতিতে সর্বস্বান্ত হওয়ার ফলে তাদের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল ঘৃণা, আক্রোশ এবং মরীয়া সংকল্প। সরকারী গির্জা, ভূস্বামীশ্রেণী ও ভূস্বামীদের গভর্ণমেণ্টকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, ভূস্বামীপ্রথার সমস্ত পুরাতন রূপ ও পদ্ধতিকে ধ্বংস করা, জমি থেকে জঞ্জাল সাফ করা এবং পুলিশ-শ্রেণী-রাষ্ট্রের বদলে স্বাধীন ও সমান ছোটচাষীদের সমাজ প্রতিষ্ঠা—এই প্রচেষ্টাই হল আমাদের বিপ্লবে কৃষকদের প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মূল সুর। তলস্তয়ের রচনায় তাঁর বিমূর্ত ‘খ্রীষ্টীয় নৈরাজ্যবাদ’ (তাঁর মতামতের সমষ্টিকে কখনও কখনও ঐ নামেই অভিহিত করা হয়) অপেক্ষা কৃষকদের উক্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্যই অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে, জীবনযাত্রার নতুন ধরণের জন্যে সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে সেই জীবন কি-রকমটি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল নিতান্ত কাঁচা, পিতৃসত্তাক্ ও আধা-ধর্মীয় ধ্যানধারণা। কোন্ ধরণের সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি অর্জিত হতে পারে, সে সংগ্রামে কি-ধরণের নেতার প্রয়োজন, কৃষক-বিপ্লবের স্বার্থের সম্বন্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব কি, ভূস্বামীপ্রথার বিলোপের জন্য জার-শাসনকে বলপ্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করাই বা কেন প্রয়োজন—এই সমস্ত প্রশ্নে কৃষকদের ধারণা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কৃষকদের সমগ্র অতীত-জীবন তাদের শিখিয়েছে ভূস্বামী ও সরকারী কর্মচারীদের ঘৃণা করতে। কিন্তু ঐ সব প্রশ্নের উত্তর কোথায় খুঁজতে হবে তা শেখায় নি, শেখানো সম্ভব ছিল না। আমাদের বিপ্লবে কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সত্যই লড়াই করেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণে সংগঠিত হয়েছিল; একটি অতিক্ষুদ্র অংশ প্রকৃতই শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার তথা জারের ভৃত্যকুল ও ভূস্বামীদের রক্ষাকর্তাদের ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছিল। কিন্তু কৃষকদের অধিকাংশই অশ্রুপাত ও প্রার্থনা, নীতিবাক্য প্রচার ও স্বপ্নচারণে ক্ষান্ত ছিল, তারা ঠিক লিও তলস্তয়ের ধরণে দরখাস্ত লিখেছে এবং 'উকীল' পাঠিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সবসময় যেমনটি হয়—ঘটেছেও ঠিক তাই। তলস্তয়ের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকা, রাজনীতি পরিহার করা ও রাজনীতিতে উৎসাহের তথা তাকে বোঝার চেষ্টার অভাব ইত্যাদির ফল হয়েছে এই যে, একটি সংখ্যালঘু অংশ শ্রেণীসচেতন বিপ্লবী শ্রমিকদের নেতৃত্ব মেনে চলেছে, আর অধিকাংশই পরিণত হয়েছে ক্যাডেট-নামধারী নীতিবর্জিত, দাসমনোভাবাপন্ন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতির শিকারে। ক্যাডেটরা ত্রুদোভিকদের* বৈঠক শেষ করেই ছুটে যেত স্তোলিপিনের দরবারে, সেখানে তারা অনুনয় বিনয়, দর কষাকষি করত, আপোষ এবং আপোষের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসত—মিলিটারী বুটের ঠোক্করে বিতাড়িত না-হওয়া পর্যন্ত তারা এই কাজই করে চলেছিল। তলস্তয়ের মতামত হল আমাদের কৃষক-বিদ্রোহের দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতার দর্পণ, পিতৃসত্তাক্-গ্রামাঞ্চলের ঢিলেঢালাভাব এবং 'উদ্যোগী কৃষকে'র মজ্জাগত ভীরুতার প্রতিবিম্ব।

১৯০৫-০৬ সালে সৈন্যদের অভ্যুত্থানের কথাই ধরা যাক। আমাদের বিপ্লবে যারা লড়াই করেছিল, সামাজিক উপাদানের বিচারে তারা ছিল অংশত কৃষক

* ত্রুদোভিক—রাষ্ট্রীয় ডুমায় নারদোনিক মনোভাবাপন্ন কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী গ্রুপটি ত্রুদোভিক নামে পরিচিত ছিল। ১৯০৬ সালের এপ্রিলে প্রথম ডুমায় কৃষক-প্রতিনিধিদের নিয়ে এই গ্রুপটি গঠিত হয়।

আর অংশত শ্রমিক। শ্রমিকেরা ছিল সংখ্যালঘু ; তাই শ্রমিকেরা যেন অঙ্গুলী-হেলনমাত্র সোশাল ডেমোক্রাটে পরিণত হয়ে যে-ধরণের জাতীয় সংহতি ও পার্টি চেতনার পরিচয় দিয়েছিল তার প্রায় অনুরূপ অভিব্যক্তিও সৈন্যবাহিনীর আন্দোলনে দেখা যায় না। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থান অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি বলে ব্যর্থ হয়েছিল এরূপ মনে করার মতো ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু নেই। বরং তার ঠিক বিপরীত। নারোদনায়া ভোলিয়ার* সময়ের তুলনায় বিপ্লবের যে কি বিরাট অগ্রগতি হয়েছে তা এই ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, 'ধূসর পশুপাল' অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের ঊর্ধতন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের সেই আত্মনির্ভরশীলতাই উদারনৈতিক ভূস্বামী ও উদারনৈতিক অফিসারদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। সাধারণ সৈনিকেরা কৃষকদের লক্ষ্য সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সহানুভূতিশীল ছিল ; জমির কথা উল্লেখমাত্রই তাদের চোখে যেন দীপ জ্বলে উঠত। একাধিক ক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীর কর্তৃত্ব সাধারণ সৈনিকদের হাতে চলে আসে কিন্তু সেই কর্তৃত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়নি বলা চলে ; সৈন্যরা দোমনা-ভাব দেখিয়েছে ; দুই একদিন পরে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে, ঘৃণার পাত্র কয়েকজন অফিসারকে হত্যা করে তারা অবশিষ্ট বন্দী অফিসারদের মুক্তি দিয়েছে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং তার পরে 'ফায়ারিং স্কোয়াডে'র সম্মুখীন হয়েছে অথবা পিঠের জামা খুলে বেত্রাঘাত সহ্য করেছে, কিংবা আবার জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে—ঠিক তলস্তয়ের শিক্ষার অনুরূপভাবে।

তলস্তয়ের রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাদের পুঞ্জীভূত ঘৃণা, উন্নত জীবনের জন্য পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা, অতীতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে কাঁচা স্বপ্ন. রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব ও বৈপ্লবিক সংকল্পে শৈথিল্য। জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনিবার্য আত্মপ্রকাশ অথচ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির অভাব এবং তলস্তয়ের শিক্ষানুসারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অ-প্রতিরোধের নীতি—এটাই ছিল প্রথম বৈপ্লবিক অভিযানের পরাজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।—এই সমস্ত ঘটনাকে বোঝা যায় তখনকার ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে।

* নারোদনায়া ভোলিয়া—নারোদনিক সংগঠন 'জেমলিয়া ই ভোলিয়া'-এর বিভেদের ফলে ১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সংগঠিত নারোদনিক সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন। এর সভ্যেরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন। কিন্তু 'সক্রিয়'-বীর ও 'নিষ্ক্রিয়'-জনতার ভ্রান্ত তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে তাঁরা আশা করতেন যে, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই, নিজেদের প্রচেষ্টায় অর্থাৎ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের দ্বারা গভর্নমেন্টকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে সমাজের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে।

কথায় বলে যে, পরাজিত বাহিনী যথোচিত শিক্ষা গ্রহণ করে। অবশ্য বিপ্লবীশ্রেণীগুলিকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা চলে খুব সীমিত অর্থে। ভূস্বামীদের এবং তাদের গভর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণাই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। যে-পরিস্থিতি অগণিত কৃষককে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত এবং তীব্রতর হয়ে চলেছে। বিনিময়ের বিকাশে বাজারের আধিপত্য এবং টাকার প্রভাববৃদ্ধি কৃষকদের নিজেদের মধ্য থেকে সাবেকী পিতৃসত্তাক্-ব্যবস্থা ও তলস্তয়ের পিতৃসত্তাক্-মতাদর্শকে ক্রমশ দৃঢ় পদক্ষেপে অপসারিত করছে। কিন্তু বিপ্লবের প্রথম বৎসরগুলি ও গণ-বিপ্লবী সংগ্রামে প্রথম পরাজয় থেকে সন্দেহাতীতভাবে একটি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তা জনগণের প্রাক্তন নম্রতা ও শৈথিল্যের মূলে হেনেছে মর্মান্তিক আঘাত। পার্থক্যের সীমারেখাগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টিগুলির মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে। স্তোলিপিনের দেওয়া শিক্ষার কঠিন আঘাতে এবং বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাটদের নিরবচ্ছিন্ন ও অবিচল প্রচারের প্রভাবে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রী-শ্রমিকদের মধ্য থেকেই নয়, গণতন্ত্রী কৃষক-জনসাধারণের মধ্য থেকেও অনিবার্যভাবে পোড়-খাওয়া ইস্পাতের মত বহুসংখ্যক যোদ্ধা ক্রমশ অধিক পরিমাণে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাদের পক্ষে তলস্তয়বাদ-রূপ আমাদের ঐতিহাসিক পাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা খুব কম।*

---

* প্রলেতারি, ৩৫ নং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১১ (২৪) ১৯০৮
কালেক্টেড ওয়ার্ক'স, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ২০২-০৯

॥ ৫ ॥

বিপ্লব ও সংস্কৃতি

[আনাতোলি লুনাচারস্কী]

[লুনাচারস্কী ছিলেন অক্টোবর-বিপ্লবের পর গঠিত প্রথম সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, কমিউনিস্ট-পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সভ্য এবং সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাডেমীর সদস্য। তাঁর বর্তমান প্রবন্ধটি ১৯২৫ সালে Das Neue Russland নামে জার্মানীতে 'নতুন রুশিয়ার মিত্রদের সমিতি'-র মুখপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বহু বছর আগে লিখিত হলেও লুনাচারস্কীর বক্তব্য আজও নানাদিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন। প্রথমত, নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি রচনার কাজে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট যে মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তা এখানে সুনির্দিষ্টরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেই যুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা, প্রশ্ন, ঝোঁক ও মত-সংঘাত দেখা দিয়েছিল সে-সবের একটি চিত্র পাওয়া যায়। তার মূল্য আজকার দিনেও কম নয়। তৃতীয়ত, অক্টোবর বিপ্লব নতুন সংস্কৃতির রচনায় যে-প্রেরণা যুগিয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূ্র্ণ বিবরণ এখানে পাই।

'সোভিয়েত ইউনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক একটি নোটে বলেছেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে তৎকালীন ঝোঁকগুলি সম্বন্ধে লুনাচারস্কীর সমস্ত বক্তব্যকেই আজ সঠিক বলা চলে না, বিশেষত তিনি যেখানে সমস্ত 'চরম বামপন্থীদের' Futurism বা 'ভবিষ্যৎবাদ' নামক একটিমাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই জটিল ও বহুমুখী গোষ্ঠীর মধ্যে মায়াকোভস্কির গোষ্ঠীও ছিল। তাছাড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অন্যান্য কতকগুলি ঘটনাকে বর্তমানে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে আরো সঠিক ও পরিণত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবু, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের মনোভাব, বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির অগ্রগতিতে উৎসাহদান এবং নতুন সংস্কৃতি রচনায় জনগণের ভূমিকা ইত্যাদি প্রশ্নের দিক থেকে প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ।]

সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-কৃষক গবর্ণমেণ্ট একেবারে গোড়া থেকেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্তব্য-পূরণে উদ্যোগী হয়।

আমাদের দেশে সাম্যবাদ গঠনের অত্যন্ত বিরাট কর্তব্য এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক, বিশেষত সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা—এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে যে অস্বাস্থ্যকর ব্যবধান, সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও কমিউনিস্ট-পার্টি প্রথম থেকেই পূর্ণ সচেতন ছিল। সেই উপলব্ধিকে আমরা গোড়ার দিকেই নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করি: ক্ষমতা দখল, দেশের ভিতরে তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক প্রতিরক্ষা—এগুলি হল প্রথম রণাঙ্গণ। দ্বিতীয় রণাঙ্গণ হল অর্থ-নীতির পুনর্গঠন এবং যতদূর-সম্ভব অগ্রগতি। তৃতীয় রণাঙ্গণ হল জনগণের সাংস্কৃতিক কল্যাণের কাজে দুইটি ধারায় বিকাশ। তৃতীয় রণাঙ্গণটির সমস্যাগুলি শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত।

গভর্ণমেণ্ট প্রথম থেকেই অতীত সংস্কৃতির সমস্ত উত্তরাধিকারকে রক্ষার জন্য সুদৃঢ় নীতি অবলম্বন করেছিল। প্রাক্-বিপ্লবযুগের সংস্কৃতির চরিত্র শ্রমিক-বিরোধী বলে অতীতের সুমহান কৃতিগুলিকে অবহেলা করা যে কত ভুল সে কথা কমরেড লেনিন দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার নীতিকে ভিত্তি হিসাবে নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়।

এর আওতায় শুধুমাত্র সংগ্রহশালার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যসম্পন্ন নিদর্শনগুলিকেই নয়, বিভিন্ন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকেও আনা হয়েছিল।

কমিউনিস্ট-পার্টি অবশ্য কখনই এমন মনোভাব গ্রহণ করেনি যে, অমার্জিত শ্রমিকদের পক্ষে অতীতের ফলগুলিকে আয়ত্ত করতে এবং চিরকাল তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বরং তার বিপরীতটাই সত্য। সমাজে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে সংস্কৃতি নতুনভাবে বিকাশলাভ করবে। গোড়াকার স্তর-গুলিতে সেই সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হবে শ্রমিকের শ্রেণী-চরিত্র। পরে ক্রমশ এবং এই সর্বপ্রথম তা সাধারণ মানবিক-চরিত্র গ্রহণ করবে। কমিউনিস্ট-পার্টি উপরোক্ত নীতিতে অবিচল আস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজে অগ্রণী হয়।

তবে কমিউনিস্ট-পার্টি মনে করত যে, ঐ ধরণে বিকাশ সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র অতীত সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ নিজ-করণের ভিত্তিতে।

অতীতের শ্রেষ্ঠ কৃতিগুলি এবং ঐতিহ্য অনুসরণকারী মহান শিল্পীদের সংরক্ষণের জন্য যে-কাজ শুরু হয় তার সামনে দেখা দেয় কয়েকটি রাজনৈতিক প্রকৃতির বাধা। লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও পার্টির কর্মসূচীতে তদনুরূপ ধারা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি তথাকথিত প্রলেতারিয় ঝোঁক মাথা তুলেছিল এবং এখনও তুলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব ঝোঁক শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার কিছু তথাকথিত অর্ধ-শিক্ষিত উপাদানগুলির সমর্থনে পুষ্ট হয়েছে। তারা অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করতে চায় এবং বিশ্বাস করে যে বিশুদ্ধ প্রলেতারিয় সংস্কৃতি স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হবে। মাঝে মাঝে ঐ

মনোভাব নিম্নোক্ত আওয়াজের রূপে দেখা দেয় : তা (অর্থাৎ নতুন জিনিস —অনুবাদক) সংস্কৃতি হিসাবে উঁচুদরের না হতে পারে কিন্তু অন্ততপক্ষে তা আমাদের নিজস্ব জিনিস।

দ্বিতীয় বিপদ দেখা দেয় অতীত সংস্কৃতির নীতিগুলির উপরে ফিউচারিস্ট বা ভবিষ্যৎবাদীদের আক্রমণের ফলে। যখন রুশীয় ফিউচারিস্টদের সুপরিচিত প্রবক্তারা পার্টিতে যোগ দেয় অথবা প্রকাশ্যে পার্টির সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে তখন ঐ বিপদ আরো বড় আকারে দেখা দিল। এরা পার্টির ভিতরে একটি শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের বক্তব্য ছিল যে (এবং তা বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়) প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব শিল্পগত সমস্যা আছে এবং তদনুযায়ী নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। এরা দাবী করত যে, আমাদের যুগের উপযোগী প্রকাশভঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং অতীতের সবকিছুকে ঝেঁটিয়ে বিস্মৃতির গহ্বরে বিদায় দেওয়া দরকার। কিন্তু উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলি কখনই গভর্ণমেণ্টের সুদৃঢ় নীতির উপরে প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

সব চেয়ে বড় বিপদ ছিল দেশের চরম দারিদ্র্য। ফলে অতীতের শিল্প সংরক্ষণ, সংস্কৃতির বিকাশ এবং শিল্পগত উত্তরাধিকারকে সমকালীন কর্তব্যের উপযোগী ভাবে ব্যবহার করা প্রভৃতি কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ দেখা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়। অনেক সময়, বিশেষ ১৯২১ সালের মত চূড়ান্ত ক্ষুধাতুর বৎসরগুলিতে, গভর্ণমেণ্টকে এমন কথাও ভাবতে হয়েছে যে, বলশয় থিয়েটারের মত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ করে দেওয়া হবে কি-না। কেন-না ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল এবং আমাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে তাদের বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট।

এইসব ক্ষেত্রে 'পিপলস্ কমিসারিয়েট অফ এডুকেশান' (জনগণের শিক্ষা-দপ্তর) অনুরূপ মতকে বাধা দেওয়ার জন্য সবরকমে চেষ্টা করেছে। কারণ ঐতিহ্যে ছেদ ঘটলে এবং ঠান্ডা বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের বা অন্য কারণের দরুণ সংগ্রহশালায় রক্ষিত নিদর্শনগুলি নষ্ট হয়ে গেলে যে-ক্ষতি হত তা অপূরণীয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা সংগ্রহশালা, শিল্প-মহাবিদ্যালয়, নাট্যশালা, সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। যে-অল্প কয়েকজন রাশিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল বা প্রতিবিপ্লবী হিসাবে বিতাড়িত হয়েছিল তারা বাদে আর সবাই নিজেদের কর্তব্যে অবিচল ছিল। সেজন্য সাহসের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, শীত এবং বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করেছে।

আমাদের সমাজের সামনে তখন সংরক্ষণ ছাড়াও, শিল্পকে সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের কাজে প্রকৃত সহায়ক-রূপে ব্যবহারের সমস্যাটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, বিপ্লবী-পুস্তিকা, নাটক ইত্যাদির বিরাট প্রচারগত মূল্যকে কমিউনিস্ট-পার্টি যথোচিত স্বীকৃতি দেয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, শিল্পের বিভিন্ন রূপকে জনগণের কাছে পরিচিত করার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা শুরু হয়েছিল।

বিপ্লবের প্রথম স্তরে অর্থাৎ নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রমিক ও সৈনিক প্রভৃতির পক্ষে রঙ্গমঞ্চের দ্বার অবারিত ছিল। তখন আমাদের সঙ্গতির বাইরে হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের জন্য বৃহৎ আকারের কনসার্ট, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। তবে রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগ (যার হাতে ছিল বয়স্ক শিক্ষার ভার) স্বভাবতই প্রচারমূলক শিল্পের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। কেন-না আমাদের দৃষ্টিতে জনগণের সাধারণ-শিক্ষা তাদের রাজনৈতিক ও কমিউনিস্ট-শিক্ষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ক্ষুধা ও যুদ্ধের বৎসরগুলিতে এ-কথা ছিল আরো বেশি সত্য। প্রথমটায় সেনাবাহিনীর সাংস্কৃতিক বিভাগ, যা ছিল সারা দেশে এখানে-সেখানে ছড়ানো, শিল্পগত প্রচারকেই কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম প্রধান দিক হিসাবে গড়ে তোলে। আমাদের সেনাবাহিনী ত ছিল প্রধানত কৃষকদের নিয়ে গঠিত। এই কাজটিতে হাত দেওয়া হয়েছিল খুবই বৃহৎ আকারে। নিষ্ঠাবান ও বীর-শিল্পীরা সমস্ত রকমের বিপদের মোকাবিলা করে সামরিক ইউনিটগুলির সঙ্গে থেকেছেন। অবশ্য ভাল প্রচার, ভাল শিল্পী, চমৎকার সঙ্গীত এবং সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক পোস্টারের পাশাপাশি কিছু খারাপ ও মেকি শিল্পের দেখা পাওয়া যায় নি তা নয়। কিন্তু মোটের উপর, গভর্ণমেণ্টের শিল্পগত প্রচারের কাজে লালফৌজ এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গৃহ-রণাঙ্গণে অর্থাৎ শহর ও গ্রামগুলির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ অনেক কম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও প্রচার-তরণী ও ট্রেণ এসে পৌঁছাত। তাদের দুই পাশের গায়ে পোস্টার এবং স্লোগানে লালে লাল হয়ে থাকত, আর ভিতরে থাকত গ্রন্থাগার, সিনেমা, গায়কদের দল ইত্যাদি। এইসব ট্রেণ এবং নৌকা গোটা রাশিয়া পরিভ্রমণ করে জনগণের বিশেষত, গ্রামের লোকদের মধ্যে, বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

শহরগুলিতে, বিশেষ করে ছুটির দিনে, শিল্প খুব ব্যাপকভাবে রাজপথে দেখা দিত। বাড়িগুলির দেওয়াল সম্পূর্ণরূপে স্টেন্সিল ও পোস্টারে ছেয়ে

যেত। প্রদর্শনকারীদের বড় বড় দল ঐ-সব জিনিসকে আরো বেশি সংখ্যায় বহন করে পথ পরিক্রমা করত। রঙ্গমঞ্চগুলির দরজা ছিল নামমাত্র মূল্যে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং বিপ্লববার্ষিকীদিনগুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। সর্বত্রই যেন শৈল্পিক জীবনের ধারা ফোয়ারার মত উৎসারিত হচ্ছিল। তার সবকিছুই হয় ত রূপের দিক থেকে মার্জিত নয়, কিন্তু সেগুলি ছিল শ্রমজীবী-জনগণের অত্যন্ত কাছের জিনিস।

নতুন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) প্রবর্তিত হওয়ার পর অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার চাপ কমে আসে। এখন তা অনেকটা শান্তরূপ ধারণ করে এবং লালফৌজের ক্লাবগুলিতে সীমিত থাকে। দ্বিতীয়ত দেখা গেল যে, সাংস্কৃতিক প্রচারের জন্য রাষ্ট্র যে-পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ করেছিল, তা সাধ্যের বাইরে। অবশ্য যত বেশী বলে অভিযোগ করা হত তা ঠিক নয় এবং সমগ্র তৃতীয় রণাঙ্গণের মত শিল্পগত প্রচারের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। কিন্তু নতুন অর্থনৈতিক নীতির দাবী হল যে, রাষ্ট্রের পক্ষে কঠোরতরভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা চাই। ফলে তৃতীয় রণাঙ্গণের শিল্প-বিভাগের সবচেয়ে মূল্যবান অংশের পক্ষেও ক্ষতির কারণ হয়।

তবে শিল্পের খাত কিছু পরিমাণে সংকীর্ণ করা হলেও এই সময়ে তার গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রভাব দৃঢ়তর হয়।

প্রথম যুগে অর্থাৎ নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তিত হওয়ার সময় পর্যন্ত যদিও পুরানো বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ আমাদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে সহযোগিতা করেছিল তবুও তারা উদাসীন হয়ে ছিল। এমন কি, সংগ্রহশালার কর্মী, রাষ্ট্রীয় নাট্যশালার অভিনেতা প্রভৃতি যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে তাদের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। অবশ্য প্রচারমূলক শিল্পের সাধারণ প্রবাহ তাদেরও আমাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ ছিল যতটা উন্নত শিল্পসৃষ্টির—নতুন সমাজের রচয়িতা হিসাবে ততটা নয়। সংক্ষেপে, একদল বুদ্ধিজীবী ছিল সম্পূর্ণভাবে আমাদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করত, তবে তাদের নিজস্ব ধরণে। শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের চরম বামপন্থী অংশই কালবিলম্ব না করে বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। আমরা সংক্ষেপে তাদের 'ফিউচারিস্ট' বলে উল্লেখ করব। যদিও শিল্পের রূপ-সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্ণমেন্ট পুরোপুরি নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করেছিল তবু সাধারণ পরিবেশের প্রভাবে আমাদের সমস্ত সুস্পষ্ট বিপ্লবী শিল্পের উপর কম বা বেশি পরিমাণে বামপন্থী ফিউচারিস্ট ছাপ পড়েছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখনীয় যে, প্রলেটকাল্টও (নতুন

অর্থনৈতিক নীতির আগে এই সঙ্ঘটির সভ্যসংখ্যা ছিল অর্ধলক্ষের বেশি) ঐ ফ্যাশানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তার ফলে এইরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় যে, প্রলেটকাল্ট বামপন্থী হয়ে পড়েছে এবং একটা বৌদ্ধিক বোহেমিয়া (Bohemia) বা নৈরাজ্যের জগতের সন্ধান করছে।

নতুন অর্থনৈতিক নীতি যে একদিকে আমাদের শিল্পজীবনের প্রবাহকে সংকুচিত করেছিল সেকথা আগে বলেছি। রঙ্গমঞ্চগুলিকে নিজেদের ব্যয় নিজেরা নির্বাহের নীতি গ্রহণ করতে হল। ফলে শ্রমিকদের পক্ষে সেখানে প্রবেশের সুযোগ কিছু পরিমাণে সংকুচিত হয়, যদিও আমরা তাদের জন্য সর্বোচ্চ-মূল্য থেকে সবচেয়ে কম মূল্যের সমস্ত আসনের শতকরা ১৫ ভাগ সংরক্ষিত করেছিলাম। পোস্টার এবং দেশের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ ছোট ছোট প্রচার-মূলক রঙ্গমঞ্চের জন্য কোনরকম বরাদ্দই রইল না। প্রচারতরণী ও ট্রেণগুলি উঠে গেল।

কিন্তু অন্যদিকে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এবং বুদ্ধি-জীবীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরাতন বুদ্ধি-জীবীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নতুন সমাজব্যবস্থার সপক্ষে আসা শুরু করে।

রঙ্গমঞ্চগুলি, এমন কি বনেদী প্রতিষ্ঠানগুলিও, কয়েকটি বিপ্লবী নাটক মঞ্চস্থ করায় উদ্যোগী হয় এবং সেজন্য উপযোগী সাহিত্যকে কাজে লাগাতে শুরু করে। 'রুশিয়ার বিপ্লবী শিল্পীদের সঙ্ঘ' নামে একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠে। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রভাবশালী কয়েকজন দক্ষ শিল্পী ঐ সঙ্ঘে যোগদান এবং পরপর কতকগুলি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এইসব প্রদর্শনী সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ যে কি-রকম আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা মস্কোতে সদ্য আয়োজিত সপ্তম ARAR প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের অন্যান্য অংশও এই পথে এগিয়ে আসছে। সম্পূর্ণ বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যথা 'মেয়ের-হোল্ড থিয়েটার', মস্কোর 'থিয়েটার অফ দি রেভোলিউশান' এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি মঞ্চ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'সহযাত্রীদের' এক বড় দল যোগ দিয়েছে। অবশ্য এসব সহযাত্রীদের সকলের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক সমান নয়। এদের এক অংশ সত্যি বিপ্লবের সন্তান, যথা সেইফুলিনা, সর্বোপরি লিওনভ এবং আরো অনেকে। এদের মধ্যে কয়েকটি উজ্জ্বল প্রতিভা চোখে পড়ে। আবার এমন অনেকে আছে যারা ছিল বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী। তারা সম্প্রতি মত পরিবর্তন করেছে এবং গভর্ণ-মেন্টের সাংস্কৃতিক নীতি সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ

করেছে। শেষোক্তদের মধ্যে কয়েকটি খুব সুপরিচিত নাম দেখা যায়। কিন্তু যারা অবিচলভাবে শ্রমিক-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছে এমন লোকদের মধ্যেও সুপরিচিত নামের অভাব নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'ভালেরি ব্রুসভ' এবং প্রবীণ লেখক সেরাফিমোভিচের নাম। শেষোক্ত জন বিপ্লবকে উপহার দিয়েছেন সাম্প্রতিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি 'Iron Flood'। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আমরা সাহিত্যের স্বর্ণযুগে বাস করছি। চিত্তাকর্ষক নতুন উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয় নি এমন একটি মাসও যায় নি। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেন নতুন নতুন নামের এক অন্তহীন পরম্পরা দেখা দিয়েছে, আর সেইসব কৃতি আশ্চর্যজনকভাবে পাকা হাতের স্বাক্ষর বহন করে।

ফিউচারিজমই বিপ্লবোত্তর শিল্পের বিশেষত্বসূচক চিহ্ন বলে পরিগণিত হত কিন্তু নবাগতেরা বহুল পরিমাণে তার প্রাক্তন তাৎপর্যকে মুছে ফেলতে সমর্থ হয়। ফিউচারিস্টরা এখন LEF (Left Front) নামক পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে, আর কয়েকটি রঙ্গমঞ্চে এবং ক্ষুদ্র শিল্পগোষ্ঠিতে টিকে আছে। তারা এখন বৈধ কাঠামোর ভিতরে, শিল্পক্ষেত্রের কর্মকাণ্ডে অন্যান্য চিত্তাকর্ষক উপাদানগুলির অন্যতম হিসাবে কাজ করছে।

প্রলেটকাল্টের কাজের পরিধি খুব সঙ্কুচিত হয়েছে, তবে তার কাজের বিষয়বস্তুতে কিছু পরিমাণে গভীরতা এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্প-ক্ষেত্রের কাজে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় VAPP বা All-union Association of Proletarian Writers' (সারা যুক্তরাষ্ট্র প্রলেতারিয় লেখক সংস্থা)-এর। এই সংগঠনটি প্রলেতারিয় লেখকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং Kunitsa (হাপর) এবং October নামে পত্রিকা প্রকাশ করছে। একদল প্রতিভাশালী প্রলেতারিয় লেখক, যারা নিজেদের Pereval (Cross Roads) নামে পরিচয় দেয়, তারা ঐ সংগঠনের বাইরে রয়ে গেছে। আর কিছুসংখ্যক প্রলেতারিয় লেখক অন্যান্য 'সহ-যাত্রী'দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। 'সহ-যাত্রী'রা krug (circle) নামক প্রকাশন সংস্থা এবং Krasnaya Nov. (New Life) নামক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে। এরা সবাই কমরেড ভোরোনস্কির সাধারণ-সম্পাদনাধীনে কাজ করছে।

তেমনি, শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরোপুরি প্রলেতারিয় আন্দোলন আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাদের প্রচেষ্টা প্রধানত ক্লাবের রূপ নিয়েছে। এইসব ক্লাবের ভিত্তি খুব দৃঢ় আর তারা প্রায়ই গভীর মননশীল শিল্পকৃতি রচনা করে। যদি এই ক্লাব থেকে নাটক চিত্রকলা ও সঙ্গীতে নতুন নতুন প্রতিভার উদ্ভব হয় তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের শিল্পবিদ্যালয়,

উচ্চতর-সঙ্গীত-শিক্ষায়তন এবং দৃশ্যশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বহু তরুণসন্তান শিক্ষালাভ করছে।

গভর্ণমেণ্টের নীতি আগের মতোই দুটি ধারাকে অনুসরণ করছে এবং যে দুটি ধারার পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। একটি হল অতীতের শিল্পকে রক্ষা। অতীত-শিল্পকে এখন ক্রমে বেশি পরিমাণে বলিষ্ঠভাবে নতুন গঠনকর্মে নিয়োগ করা হচ্ছে, রূপের কিছুটা অদলবদল করে। অপর দিকটি হল নতুন এবং সুস্পষ্টভাবে বিপ্লবী শিল্পকে উৎসাহ দান। State Literature Administration বা রাষ্ট্রীয় সাহিত্য প্রশাসন Censorship-এর বেলায় খুবই মোলায়েম নীতি অনুসরণ করছে। শুধুমাত্র প্রতিবিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্যকেই নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। যে-সব ক্ষেত্রে কোন সেন্সর (যথা Central Repertoire Committeeতে) স্বাধীনভাবে শিল্পসৃষ্টির কাজে বাধা সৃষ্টি করে সে-সব ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট ও পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থাগুলি হস্তক্ষেপ করে থাকে। তা ক! হয় শিল্পকে যথাসম্ভব স্বাধীনতাদানের নীতির অনুকূলে। তবু একদিকে চিরায়তসাহিত্য থেকে শিক্ষালাভের পক্ষপাতী এবং অন্যদিকে ফিউচারিস্ট—এই দুই ঝোঁকের মধ্যেকার পুরনো লড়াইয়ের জের এখনও চলছে। তেমনি সংঘাত চলেছে একদিকে যারা বিশুদ্ধ প্রলেতারিয় শিল্পের সমর্থক এবং অন্যদিকে যারা আমাদের কাজে পাতি-বুর্জোয়া ও আধা-বুর্জোয়া সহ-যাত্রীদের টেনে আনার পক্ষপাতী, এই দুই ঝোঁকের মধ্যে।

এই সব প্রশ্নের সমাধান মধ্যপন্থা অনুসরণের দ্বারা সহজেই করা যায়। পার্টির তরফ থেকে নিঃসন্দেহে অদূর ভবিষ্যতেই সুদৃঢ় এবং নিয়ামক-নির্দেশ দেওয়া হবে। তা শিল্প সম্বন্ধে People's Commissariat for Education-দ্বারা এ যাবৎ অনুসৃত নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন করবে।

আমরা এখনও খুব গরীব। শিল্প ও সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, মিউজিয়াম ও রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা প্রভৃতিকে যে অর্থসাহায্য দেওয়া হয় তা নিতান্ত অল্প। নিকট ভবিষ্যতে তার পরিমাণ বাড়াতে হবে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ ছাড়া সাধারণের পক্ষ হতে সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যে অর্থব্যয় করা হয়ে থাকে তা যথেষ্ট নয়। দৃশ্যশিল্পের জন্য বে-সরকারী বাজার প্রায় উঠে গেছে। আমাদের অত্যন্ত কঠিন বাধার সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ক্লাবগুলিও সঙ্গীতের স্বল্পতা সম্বন্ধে অভিযোগ করে থাকে অথচ এইগুলিই হল সোভিয়েত ইউনিয়নে এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি-বিকাশের উজ্জ্বলতম আশাভরসাস্থল। তবে তাদের সবগুলিই আজ বিপুল উৎসাহের দ্বারা অনুপ্রাণিত। শিল্প বর্তমানে যে-ভাবে ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে উঠছে তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই।

সর্বপ্রথম সারিতে স্থান নিয়েছে সাহিত্য। ইতিমধ্যেই তা আমাদের উপহার দিয়েছে লিওনভের 'Badgers', সেইফুলিনার 'Virinea', মায়াকোভস্কি ও বেজিমনস্কির কবিতা, সেরাফিমোভিচের 'Iron Flood', ফুরমানভের 'Chapayev', লিবেদিনস্কির 'Week' ইত্যাদি শ্রেষ্ঠকীর্তি। সাহিত্যের সমস্ত অবদানগুলির উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। বিপ্লবী নাটকও অনুরূপ উচ্চ মানের দিকে এগিয়ে চলেছে। নাট্যজগতে প্রকৃতপক্ষে এক নতুন উষার উদয় হয়েছে। মস্কোতে, নানা বাস্তব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বহু উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠছে। তারা নতুন নতুন রূপের জন্য সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে এমন সব অবদান উপস্থাপিত করছে যে ̍ লির শিল্পগত গভীরতা আমাদের খুব বিস্মিত করে দেয়। এই বৎসরের ে ব অবদানের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ নেই সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল: মেয়েরহোল্ড মঞ্চে অভিনীত 'The Wood', তরুণ শিল্পীদের মঞ্চ দ্বারা অভিনীত 'Hamlet' ও 'Blokha' (The Flea); গোলেইজোভস্কির নেতৃত্বে গঠিত বলশয় থিয়েটারের নতুন দল : ভাখতানগভ স্টুডিয়োর আকর্ষণীয় কীর্তি এবং 'Echo', 'Pie in the sky' ইত্যাদি বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চ (Theatre of Revolution) কর্তৃক অভিনীত অনেকগুলি পুরোপুরি বিপ্লবী নাটক। মস্কোতে এবং সাধারণভাবে রুশিয়ায় আমাদের সমালোচক ও দর্শকেরা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের সমস্ত গুণ, বৈচিত্র্য ও মূল্যকেই যে স্বীকৃতি দেয় তা নয়। এখানে একটি কথা বলা দরকার, ব্যালের মত যে-সব পুরনো শিল্পরূপকে আমরা বজায় রেখেছি তার গুণগত মান নেমে ত যায়ই-নি বরং আমাদের ব্যালে-শিক্ষার স্কুলদুটি নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করেছে। ফলে আমাদের ব্যালে-দলগুলিকে কয়েকজন প্রথম-শ্রেণীর অভিনেতাকে নিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে।

আর্থিক অনটন সত্ত্বেও আমাদের শিল্প ও সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়গুলি এক নতুন উজ্জ্বল পুরুষের (generation) সৃষ্টি করেছে। Ivhutemas (শিল্প ও প্রয়োগবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনগুলি)-এর শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে দেখা গেছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। আমাদের তরুণ সঙ্গীতশিল্পীরা এত তাড়াতাড়ি যে-পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করেছে তার অভিব্যক্তি প্রদর্শনীকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মোদ্দা কথা, যে তরুণদল আমাদের স্থান নেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে তারা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত, প্রতিভাবান এবং সুশিক্ষিত। শিল্প সম্বন্ধে আমাদের অনুসৃত নীতির সপক্ষে এটাই হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

॥ ৬ ॥

ম্যাকসিম গোর্কীর জীবন ও শিল্পজিজ্ঞাসা

ম্যাকসিম গোর্কীর শিল্পজিজ্ঞাসা পরিপূর্ণভাবে তাঁর জীবনজিজ্ঞাসারই প্রতিফলন। তাঁর শিল্পতত্ত্ব রূপায়িত হয়ে উঠেছে নিজেরই সারা জীবনের সংগ্রাম ও সত্যের সন্ধানের অগ্নিপরীক্ষায় যাচাই হয়ে। অনেক মহৎশিল্পীর ক্ষেত্রে তাঁর জীবনদর্শন ও ব্যবহারিকজীবনের আচরণের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, নতুবা দেখা যায় জীবনদৃষ্টি ও শিল্পী-সত্তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব। যথা, দার্শনিক তলস্তয় ও শিল্পী-তলস্তয়ের দুই সত্তার সংঘাতের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। গোর্কীর জীবনে দ্বন্দ্ব ছিল না তা নয়, তবে তা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্পজিজ্ঞাসা গড়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে। তাদের মধ্যে যদি কখনও বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে তা দেখা দিয়েছে একই দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যের দুই দিক রূপে। তাই তাঁর সমগ্র জীবন ও শিল্পসৃষ্টিকে বলা যায় এক অনবদ্য সুসমঞ্জস সংগ্রামী ঐকতান।

একথা সবাই জানে যে, যাত্রার প্রারম্ভে তাঁর সামনে লক্ষ্য পরিষ্কার ছিল না। কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদকে আশ্রয় করে তাঁর পথ চলা শুরু হয়নি। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কঠোর বেদনাময় জীবনের অংশীদার হিসাবে সেই বেদনার উপরে বিজয়লাভের পথের সন্ধান করতে করতে তিনি সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সচেতন সৈনিকে পরিণত হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে সার্থক-ভাবে প্রতিফলিত করে তুলেছেন সাহিত্যে। সাহিত্যকে তুলে ধরেছেন সমাজ তন্ত্রের জন্য বিজয়-অভিযানের চির-অম্লান আলোকশিখারূপে। তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা এক সংগ্রামী, বস্তুনিষ্ঠ অথচ মহান ভবিষ্যতের স্বপ্নে অনুপ্রাণিত শিল্পজিজ্ঞাসায় সহস্রদলে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

আমার মনে হয় যে, সেই বিকাশের প্রক্রিয়াটিই সমস্ত দেশে গোর্কীর উত্তরসাধকদের পক্ষে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির সাধনায় সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরা-ধিকার। বিশেষত এদেশে আমরা যারা সাহিত্যকে শোষণহীন সমাজগঠনের জন্য শ্রমজীবী-মানুষের অভিযানে বিশ্বস্ত ও সক্রিয় সাথীরূপে পেতে চাই তাদের পক্ষে উক্ত প্রক্রিয়াটিকে সামগ্রিকভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন খুব বেশি। আমাদের দেশে শ্রমজীবী-মানুষের সংগঠিত ও সচেতন আন্দোলনের ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়। সে ইতিহাসে রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য, রয়েছে বহু সংগ্রামী চরিত্র এবং সফল রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির অজস্র উপাদান। অথচ সাহিত্যে তার

যথোচিত প্রতিফলন হয়নি। শ্রমজীবী-মানুষের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে রচিত সাহিত্যে হয় প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ ফটোগ্রাফধর্মী চিত্রণ নতুবা চরিত্রগুলিকে যান্ত্রিক ও কৃত্রিমভাবে কতকগুলি শ্লোগানের প্রতিমূর্তিতে পরিণত করার ঝোঁকটাই প্রবল হয়ে রয়েছে। ফলে ক্ষতি হচ্ছে নানা দিক থেকে। সমাজতন্ত্রের শত্রুপক্ষ অপপ্রচারের সুযোগ ত পায়ই। প্রগতিশীল লেখকদেরও অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আর শ্রমজীবী-আন্দোলনের কর্মীদের এক অংশের মধ্যে শ্রেণীসচেতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা, এমন কি সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা সম্বন্ধেও বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। তাই গোর্কীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে নিছক আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধানিবেদনে বা ভাসাভাসা আলোচনায় সীমিত রাখার বদলে তাঁর মহান উত্তরাধিকারকে বোঝা এবং কাজে লাগাবার চেষ্টাই প্রধান কর্তব্যরূপে নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধটি সেদিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র।

যে ঐতিহাসিক পরিবেশে গোর্কীর জীবনজিজ্ঞাসার উন্মেষ হয় সেখান থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। সেই পরিবেশের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন আনাতোলি লুনাচারস্কী তাঁর 'তলস্তয় অ্যান্ড গোর্কী' নামক প্রবন্ধটিতে[১]। রুশ-সাহিত্যে তলস্তয়ের যুগের যেখানে অবসান সেখান থেকে গোর্কীর যুগের শুরু। তলস্তয়ের যুগ ছিল উদীয়মান পুঁজিবাদের নির্মম আঘাতের পর আঘাতে কৃষক ও অভিজাত ভূস্বামীদের পুরাতন রাশিয়া ভেঙ্গে পড়ার যন্ত্রণাদায়ক যুগসন্ধি।

সেই ভয়ংকর, রক্তাক্ত, অশ্রুস্নাত নাটকের নায়ক ছিল অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকেরা। সমস্ত দেশ জুড়ে জেগে উঠেছে আকুল জিজ্ঞাসা—এই অসহনীয় দুঃখের ও নৈরাশ্যের বোঝার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কোন্ পথে? তলস্তয় তাঁর সাহিত্যে রুশিয়ার কৃষকদের সেই বেদনা, আর্তনাদ ও পথের সন্ধানকে রূপ দিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অভিজাত ভূস্বামীশ্রেণীর অবক্ষয়ের জীবন্ত চিত্র।

গোর্কী যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ততদিনে পুঁজিবাদ আরো বেশি এগিয়ে গিয়েছে ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। বৃহৎ পুঁজিপতিরা ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু এই ভূস্বামীরাও নতুন ধরণের। পুঁজিবাদ এগিয়ে চলেছে সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলিকে বজায় রেখে, স্বৈরতন্ত্রের ছত্রছায়ায়। পুলিশ ও পাদ্রীদের সাহায্যে সর্বশ্রেণীর জনগণকে দাবিয়ে রাখছে। অন্য দেশের ইতিহাসে পুঁজি-বাদ অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় যে-সব সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ভূমিকা

পালন করেছিল তার খুব নগণ্য অংশই এখানে পালিত হয়। লুনাচারস্কী এই পুঁজিবাদকে পুরোপুরি নরখাদক ও লুণ্ঠনকারী বলে অভিহিত করেছেন।

পুঁজিবাদের অগ্রগতির ফলে গ্রামের উপর নির্মম শোষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শহুরে অল্পবিত্ত পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবনযন্ত্রণাও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তাদের এতদিনের সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গোর্কীর চিন্তা ও জিজ্ঞাসার উন্মেষ হয়েছে এদেরই মধ্যে। তাই তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলিতে এদেরই ছবি দেখতে পাই।

তবে তলস্তয়ের পরিবেশের সঙ্গে গোর্কীর মনের বিকাশের পটভূমির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অভিজাত বংশোদ্ভব কাউন্ট তলস্তয় নিজ-শ্রেণীর ধ্বংসের ঐতিহাসিক অনিবার্যতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মতাদর্শের দিক থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন নিজ-শ্রেণীর মানসিকতার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে এসে কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতায়। কিন্তু কৃষকদের সামনেও তখন মুক্তির পথ ছিল না। তাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ ছিল গাঢ় তমিস্রায় ঢাকা। সে পথ আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎশিল্পে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ের ফলে।

লুনাচারস্কী বলেছেন, সেই পুঁজিবাদ তার পরিপক্কতা ও অপরিপক্কতা দুইয়ের দ্বারাই দেশকে পীড়ন করেছে। সেই পুঁজিবাদ ছিল তার অনিবার্য ধ্বংসের অশুভ বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত। তার মধ্যে নৈরাশ্যের সুরটি ছিল খুবই প্রকট।

কিন্তু ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট ও তার মৃত্যুবাণ-স্বরূপ শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে। গোর্কীর জীবনজিজ্ঞাসা যখন কৈশোরের রোম্যাণ্টিক স্বপ্নের স্তর অতিক্রম করে বাস্তবের গভীরে প্রবেশ করছে ততদিনে রুশের শ্রমিকশ্রেণী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার নিজের এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের মুক্তিসংগ্রামের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তার অগ্রবাহিনীর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোর্কীর পটভূমির এই দ্বৈতচরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর ভবিষ্যতের মহান সম্ভাবনা।

গোর্কীর প্রথম জীবন কেটেছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কুৎসিত. শ্বাসরোধকারী যে পরিবেশে তা থেকে মুক্তি পাবার, তথা বৈচিত্র্যের সন্ধানে, তিনি নিরুদ্দেশের যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। সেই যাত্রার পথে ভবঘুরে, বেদে, গ্রামের কৃষক, ভোলগা নদীর মাঝি-মাল্লা, নারোদনিক বিপ্লবী, নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় ইত্যাদি বহু বিচিত্র ধরণের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে ওঠে।

সত্যের সন্ধান এগিয়ে চলে। ব্যক্তি তথা শিল্পী-মানস সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর নিজের শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কর্মক্ষেত্র খুঁজে পান এবং সেই শ্রেণীর জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ হন তখনই তাঁর শিল্পীমন পরিণতির প্রক্রিয়া লাভ করে অভ্রান্ত পরিপ্রেক্ষিতে। সেটা ছিল তাঁর জীবনের কঠোর সংগ্রামী অভিজ্ঞতারই যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি! সাহিত্যে শ্রমজীবী জনগণ ও নিপীড়িত মানবতার মুক্তিপথের দিশারী হিসাবে গোর্কীর প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই। গোর্কীর শিল্পচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনার আগে ঐ প্রস্তুতিপর্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানা দরকার।

গোর্কীর 'আত্মজীবনী' ও অন্যান্য কয়েকটি রচনা (যথা, 'হাউ আই স্টাডি'ড, 'অন বুকস' প্রভৃতি প্রবন্ধ) থেকে দেখা যায় যে, তিনি প্রথম থেকেই পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং তার উর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস পেয়েছেন। জীবনের অত্যন্ত হতাশাকর মুহূর্তগুলিতেও পুরোপুরি নিরাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। স্বভাবতই প্রথম দিকে সে বিদ্রোহ ছিল অচেতন, অস্পষ্ট। বালকের মন স্নেহ, ভালবাসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ কিন্তু এক দিদিমা ছাড়া আর কারুর কাছে তা পায়নি। ফলে বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠেছে একদিকে আক্রোশ এবং অন্যদিকে নিঃসঙ্গতার বোঝা। সুখের বিষয় যে, সেই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রথম থেকেই ইতিবাচক পথে আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই দিদিমার কাছে শোনা গান, গল্প ইত্যাদি তাঁকে দিয়েছে অব্যবহিত বাস্তবের থেকে স্বতন্ত্র আর এক জগতের সন্ধান।

দুই জগত, যা তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তা মানুষের সংকীর্ণতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, অর্থগৃধ্নুতায় দুঃসহ। বেশির ভাগ মানুষ যেন পশুর মত জীবন যাপন করছে। অন্যদিকে দিদিমার মুখে শোনা গল্প মানসনেত্রের সামনে তুলে ধরে এমন এক জগতের ছবি যেখানকার জীবন যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি, সেখানে আছে মহত্ত্ব, সৌন্দর্য, মানবতার গরিমা।

ঠিক তেমনি ভাবে দেশবিদেশের সাহিত্য চোখের সামনে যে দুনিয়ার ছবি তুলে ধরেছে তা প্রাত্যহিক পরিচিত পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে এমন সব মানুষকে দেখেছেন যাদের ব্যক্তিত্ব চেনা মানুষদের থেকে একেবারে আলাদা ছাঁচে গড়া। গোর্কী বলেছেন যে, বইগুলি যেন তাঁকে এক বৃহত্তর জীবনের বাণী শুনিয়েছে—যে দুর্গন্ধ পঙ্ককুণ্ড তার মুর্খতা ও গ্লানির আবর্তে তাঁকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল সেই পঙ্কের উপরে উঠতে সাহায্য করেছে।

কিশোর বয়সে, মনের পাপড়িগুলি যখন সবে বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে

তখন গোর্কীর মত গভীর সংবেদনশীল সক্রিয় মনে রোম্যান্টিকতার আমেজ খুব গাঢ় হয়েই দেখা দেয়। তবে দেখা যায় যে, প্রথম থেকেই গোর্কীর রোম্যান্টিক প্রবণতায় সংগ্রামী সুরটিরই অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংকল্পই প্রধান।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে নিজেই সেই সময়ের বিকাশমান ব্যক্তিত্ব ও দ্বৈত সত্তার একটি অপরূপ বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন: একদিকে আমি ছিলাম জীবনের মর্যাদার বিকৃতি ও অবমাননা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর। প্রাত্যহিক জীবনের বীভৎসতা যেন আমাকে নুইয়ে ফেলত। আমার এই ব্যক্তিত্ব চাইত তপস্বীর মত বইয়ের জগতে, অথবা কোন মঠে কিংবা কোন বনরক্ষকের কুটিরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে। এক কথায় মানুষের সংশ্রব ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে।

অন্যদিকে, অপর ব্যক্তিত্বটি অগ্নিদীক্ষা লাভ করেছিল মহৎ সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনের অভিশাপগুলির বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে বলিষ্ঠ বাহু তুলে মাথা উন্নত করে দাঁড়াতে চাইত এই ব্যক্তিত্বটি। এখানে ভালবাসা ও মানুষের দুঃখের জন্য অনুকম্পার চরিত্র ছিল সক্রিয় ও সংগ্রামী। গোর্কী বলেছেন যে, তাঁর এই ব্যক্তিত্বটি শিভলরির যুগের বীরদের মতই সর্বদা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যেন নিষ্কাসিত তরবারি হাতে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল।

দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংগ্রামে দ্বিতীয়টিই চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করে। বাইরের জগতে এবং নিজের অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের আগুনে পুড়ে ইস্পাতের মত কঠিনভাবে গড়ে ওঠে বাস্তবের উপর বিজয়লাভের সংকল্প। একক নয়, সমবেত সংগ্রাম। তিনি উপলব্ধি করতে শেখেন যে, তিনি একলা নন, আরো অনেকে আছে তাঁর সঙ্গে। বিভিন্ন দেশে ও কালে যে-সব বিদ্রোহী মানুষ সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করেন।

জীবনের অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর লেখার মধ্যে প্রথম থেকেই ধ্বনিত হয় বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির দুঃখ, বেদনা, পরাজয়, মৃত্যু ইত্যাদিই যে শেষকথা নয় তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে থাকে। রোম্যান্টিকতার প্রথম দিকে কল্পনার যে স্বপ্নচারণের আমেজ ছিল তা কেটে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বলিষ্ঠ সংগ্রামী রোম্যান্টিকতারূপে।

এক সময়ে তিনি ভবঘুরেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রথম দিকের লেখায় তাদের চরিত্রকে কিছুটা রোম্যান্টিক রঙে চিত্রিত করেন। ভবঘুরেদের প্রতি আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, তাদের মনে হত প্রাত্যহিক-পঙ্কে নিমজ্জিত সাধারণ মানুষগুলির থেকে আলাদা ধাঁচের মানুষ বলে।

নিজ শ্রেণী বা বর্ণ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে তাদের দেহমন থেকে যেন পুরাতন সামাজিক পটভূমির সমস্ত চিহ্ন ধুয়েমুছে গিয়েছিল।

গোর্কী নিজেও কয়েকবার ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু জীবনের অমোঘ অভিজ্ঞতা তাঁর বিদ্রোহী মনকে আবার ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামের ময়দানে। 'মাই কম্পানিয়ান', 'দি রোগ' প্রভৃতি গল্প-গুলিতে তিনি ভবঘুরেদের সম্বন্ধে মোহমুক্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই সব শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তিদের অহংবাদ ও শ্রমকে এড়িয়ে চলার মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছেন।

গোর্কীর রচনায় প্রায় গোড়ার দিক থেকে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে। শোষণভিত্তিক সমাজে সেই শ্রম ও প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে যে মর্মান্তিক বিরোধ রয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন হতে শুরু করেছেন।

সমাজ থেকে পলায়নই যে জীবনের কঠোরতার জবাব নয় এই উপলব্ধি নিয়ে তিনি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। তাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন সত্যনিষ্ঠ, সম্পূর্ণ ও মোহমুক্ত দৃষ্টিতে। জীবনের রুক্ষ উলঙ্গ কুৎসিত দিকগুলিকেও অনাবৃত করে তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি। বাস্তবের ভয়াবহ ফাটল ও গহ্বরগুলির মধ্যেও সত্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু বাস্তবের নিছক ফটোগ্রাফধর্মী বিবরণদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বাস্তবের উপরে বিজয় লাভের সংকল্প নিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে জানা—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আত্ম-জীবনীর একস্থানে তিনি বলেছেন যে, 'বাস্তবের কঠোরতাকে রামধনুর রঙে চিত্রিত করা উচিত নয়। জীবন ঠিক যেমনটি সেইভাবে তাকে দেখা উচিত। মানুষের হৃদয়ে ও মনে যা-কিছু ভাল এবং মানবিক তাকে সত্যজ্ঞানের দ্বারা শক্তিশালী করা উচিত।'

তাঁর বাস্তবতার চরিত্র ক্রমশ অবিচল পদক্ষেপে সংগ্রামী বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। নিজে বাস্তবের নিষ্ঠুর কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও তার তিক্ততাকে আকণ্ঠ পান করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন হতাশা ও নৈরাশ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী। প্রাক্-বিপ্লব রুশসাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি উত্তরজীবনে মন্তব্য করেছিলেন যে, তা হল ইউরোপে সবচেয়ে নিরাশাবাদী সাহিত্য। এই প্রসঙ্গেই লেনিনের চরিত্রের একটি প্রধান দিকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, লেনিন সমস্ত রকমের দুঃখ, যন্ত্রণা ও বেদনাকে ঘৃণা করতেন, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এইগুলি মানুষের জীবনের আবশ্যিক ও অপরিহার্য অঙ্গ নয়, মানুষ সচেতন ভাবে নিজের দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটাতে পারে সমবেত সংগ্রামের মাধ্যমে। ঐ প্রবন্ধে গোর্কী মন্তব্য করেন যে, যে-দেশের মহত্তম শিল্পকীর্তিগুলি রচিত হয়েছে মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণাকে অবলম্বন করে সেই দেশেই লেনিন

শ্রমজীবী জনগণকে এক বলিষ্ঠ আশাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই অপরাজেয় আশাবাদই গোর্কীর সাহিত্য-কৃতিতে, এমন কি যে-সব রচনায় ভাগ্যহত নিপীড়িত অবমানিত মানবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যেও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গোর্কীর এই বাস্তবতা ও সংগ্রামী রোম্যান্টিকতার মধ্যে মূলগত বিরোধ নেই। একে হল অপরের পরিপূরক। উত্তরজীবনে তিনি এই ধরণের রোম্যান্টিকতাকে বিপ্লবী রোম্যান্টিকতা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, নিষ্ক্রিয় রোম্যান্টিকতা মানুষকে শেখায় হয় বাস্তবকে নিছক অলীক কল্পনার রঙে চিত্রিত করে ভুলিয়ে রাখতে অথবা বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। আর বিপ্লবী রোম্যান্টিকতা মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে, প্রচলিত অবস্থা ও সমস্ত রকমের দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। এই রোম্যান্টিকতার উৎস হল বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ও নিজের সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা।

গোর্কীর এই মানবতাবাদ ছিল সংগ্রামী মানবতাবাদ। তাঁর মানবপ্রেম মানুষের প্রতি অনুকম্পা নয়; মানুষের অত্যাশ্চর্য জীবনীশক্তি ও সৃজনক্ষমতার প্রতি আস্থাই হল তার প্রাণবস্তু। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, মানবতাকে তার ইতিহাসের গোড়ার দিক থেকে এ-যাবৎ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। তবু মানুষ জীবনের ট্রাজেডিগুলিকে শিল্পে রূপায়িত করেছে। এই রূপান্তরের চেয়ে মহান আর কিছু নেই। বস্তুত মানবতার সমগ্র ইতিহাসে যা-কিছু মহান ও সুন্দর, তার উৎস হল মানুষের সমবেত শ্রম, সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা।

কিন্তু শোষণ-ভিত্তিক সমাজে শ্রমের ট্রাজেডি এবং শ্রমজীবী জনগণের অর্থাৎ মানবতার বৃহত্তম অংশের চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার সঙ্গে ত তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। সেই অবমাননা ও লাঞ্ছনার সামাজিক চরিত্র এবং কারণও তাঁর সামনে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই সমাজের পরগাছা পরশ্রমভোজীদের স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল।

মানবচরিত্রের জান্তব দিকগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত বেশি ছিল সে বিষয়ে বর্ণনা দেওয়ার দরকার করে না। কিন্তু ঐ অবস্থার জন্য যে শোষণ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাই মূলত দায়ী সে সত্যটিও তাঁর সামনে সহজেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাই তাঁর ঘৃণা, আক্রোশ ও বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছে সেই সমাজ-ব্যবস্থার, বিশেষত পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে।

যে মানবতাবাদ নিপীড়িত মানুষের প্রতি নিছক অনুকম্পাতেই সীমিত

তার সঙ্গে গোর্কীর মানবতাবাদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। পাশ্চাত্যে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের দিক্‌পালদের মানবতাবাদের অবদানকে তিনি অস্বীকার করেননি। তবে সেই মানবতাবাদের সীমিত চরিত্রের কথা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। সেই মানবতাবাদ যে শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তির পথের সন্ধান দিতে পারে না তার এই দুর্বলতা উদ্‌ঘাটনে দ্বিধা করেননি। মানবতাবাদের নামে যখন শোষণভিত্তিক সমাজের চরিত্রকে ঢাকা দেওয়ার বা শ্রমজীবী মানুষকে সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছে তখন তার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে গোর্কীর বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ।

তলস্তয়ের সাহিত্যপ্রতিভাকে যে গোর্কী কত শ্রদ্ধা করতেন সে কথা সুবিদিত। কিন্তু তলস্তয় যখন ১৯০৫ সালের রুশবিপ্লব সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন তখন গোর্কী তলস্তয়ের মতামতের অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করে চিঠি লিখতে দ্বিধা করেননি।

শোষণ-ভিত্তিক সমাজ, বিশেষত পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণের সংকল্প তাঁকে বিপ্লবী শ্রমিক-আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে। গোর্কী যে স্বৈরতন্ত্রের পুলিশের হাতে বারবার লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ হয়েছিলেন সে কথা সুবিদিত। কিন্তু তিনি যে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসের সেই ঐতিহাসিক 'রক্তস্নাত রবিবারে'র শ্রমিক মিছিলের একজন প্রত্যক্ষ শরিক ছিলেন সে ঘটনাটি অনেকে জানেন না।

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ গ্রহণের ফলে তাঁর শিল্পী-মানসের সামনে নবসৃষ্টির মহান সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণালাভে তাঁর শৈল্পিক বাস্তবতা 'সমালোচনাত্মক বাস্তবতা'র (critical realism) গণ্ডী অতিক্রম করে নতুন গুণগত স্তরে উত্তরিত হয়। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ অভিযোগ ও তার মুখোস উন্মোচনে সীমিত না থেকে এখন গোর্কীর সাহিত্যে ধ্বনিত হতে থাকে সেই সমাজের উচ্ছেদের জন্য মেঘমন্দ্র আহ্বান। বর্তমানের গর্ভে জন্ম নিয়ে ভবিষ্যতের যে-বীজ ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, ভাবীকালের যে-সম্ভাবনা শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলেছে, তার তাৎপর্যকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলাই হল এই নতুন বাস্তবতার প্রাণবস্তু। অর্থাৎ পুঁজি-বাদী সমাজের জঠরে জন্ম নিয়েছে ভবিষ্যতের রচয়িতা যে-শ্রমিকশ্রেণী তার সঙ্গে একাত্মতা এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন, আগামীকাল যে-শক্তি অমোঘ ভাবে বিজয় লাভ করবে তার সেই বিজয়ের প্রস্তুতি-অভিযানের পথকে আলোকিত করা। এই নতুন ধরণের শৈল্পিক বাস্তবতা উত্তরকালে 'সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতা' নামে প্রতিষ্ঠালাভ করে। গোর্কী হলেন তার পথিকৃৎ।

এর আগে পর্যন্ত গোর্কীর ভূমিকা ছিল যেন কৃষকের ছেঁড়া জামা ও বুট পরে, শ্রমের ক্লেদ অঙ্গে বহন করে শিষ্টসাহিত্যের ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ে সমাজের অত্যাচারে অবমানিত মানুষের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়ে আসা। আর এখন থেকে তাঁর প্রধান ভূমিকা হল নিপীড়িত মানুষের অগ্রবাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর পথপ্রদর্শকের কাজ করা। নতুন চেতনার আলোকে ও বিপ্লবী-সংগ্রামের আগুনে পুড়ে তাদের মধ্য থেকে যে নতুন মানবতা জন্ম গ্রহণ করছে তার মহিমাময় মূর্তিটিকে সাহিত্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা।

এই নতুন শৈল্পিক বাস্তবতার প্রথম রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে 'দি ফিলিস্টাইনস' ও 'দি এনিমিস' নাটকে এবং তারপরে বিশ্ববিখ্যাত 'মাদার' উপন্যাসটিতে দেখা যায় তার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা।

উপরের বক্তব্যের অর্থ অবশ্য এই নয় যে, এরপর থেকে তিনি 'সমালোচনাত্মক বাস্তবতা'র অস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ করেছিলেন। সেরূপ মনে করাটা হবে বাস্তবতা সম্বন্ধে নিতান্তই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। গোর্কী লেনিন সম্বন্ধে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর (লেনিনের) মধ্যে দুটি পৃথক ক্ষমতা অর্থাৎ সমালোচক এবং সৃষ্টিকর্তা—এই দুই ক্ষমতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। অন্তত উপরোক্ত স্তর থেকে শিল্পী গোর্কীর সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

সমালোচনাত্মক বাস্তবতার সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ চরিত্র সম্বন্ধে গোর্কী অনেকদিন আগেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। জীবন ও সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতিতে উক্ত বাস্তবতার ঐতিহাসিক গন্ডীবদ্ধতা সম্বন্ধে ১৮৯৮ সালে চেকভের নিকটে লিখিত পত্রে তিনি বাস্তবতার অগ্রগতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেন এবং ১৯০০ সালে লিখিত পত্রে বলেন যে, সাহিত্যে বীরত্ব ও বীরচরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক সাহিত্যের পক্ষে জীবনকে একটু উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করা আবশ্যক।

বলাবাহুল্য যে, উজ্জ্বল রং বলতে তিনি কৃত্রিম রঙের কথা বলেননি। সমসাময়িক মানুষের মধ্যে বীরত্বের যে লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে তারই কথা বলেছিলেন।

গোর্কীর বাস্তবতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় উত্তরণের প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং আগামী দিনের চারণ হিসাবে তাঁর শিল্পী-মানসের পরিচয়।

১৮৯৮-৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ফোমা গরদিয়েভ' বইটির নায়কের নামে নামকরণ হয়েছে। তাতে পুঁজিবাদী সমাজের দেউলিয়াপনার

চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ফোমা নিজে পুঁজিপতি শ্রেণীর লোক হলেও সেখানে সে একেবারে বে-মানান। সে নিজ-শ্রেণীর আসন্ন ধ্বংসের কথা উপলব্ধি করেছে।

ঐ উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয় তখন পাঠকদের অনেকের মনে হয়েছিল যে, বইয়ে বর্ণিত পরিবর্তন এখনও সুদূর পরাহত। কিন্তু তার দুই বৎসরের মধ্যে গোর্কী বিখ্যাত 'ঝোড়ো পাখীর গান' রচনা দ্বারা বিপ্লবের আসন্নতার কথা ঘোষণা করেন এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টার জন্য আহ্বান জানান।

'লোয়ার ডেপথস্' নাটকটিতে তিনি পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের লাঞ্ছনার নিদারুণ চিত্র আঁকবার সঙ্গে সঙ্গে মানবতাবাদের সমস্যাটিকে দার্শনিকরূপে উপস্থাপিত করেন। মানবতাবাদ সম্বন্ধে ধারণা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসের তথা নতুন ইতিহাস রচনার জন্য শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবতাবাদের ধারণার সামনে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, প্রয়োজন হয়েছে তাকে নতুন রূপদানের। 'লোয়ার ডেপথস্' নাটকটিতে মেকী এবং নিষ্ক্রিয় উভয় ধরণের মানবতাবাদ, যা জনগণকে সংগ্রামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে বর্জন করা হয়েছে। সেখানে শুনি মানুষের মর্যাদা ও মুক্তি অর্জনের ক্ষমতার দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত মানবতাবাদের জয়গান।

তবু ঐ নাটকের পরিসমাপ্তি হয়েছে শুধু প্রতিবাদে। কিন্তু 'দি ফিলি-স্টাইনস', 'দি এনিমিজ' নাটকে এবং 'মাদার' উপন্যাসে প্রথম দেখা যায় যে শ্রমিকশ্রেণী শুধু নিপীড়িতরূপেই দেখা দেয়নি, সংগ্রামী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিজের মুক্তি অর্জনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে অর্জন করেছে সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং সমগ্র নিপীড়িত মানবতার মুক্তিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে। বাস্তবতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চেতনার মিলনে জন্ম নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।

'দি ফিলিস্টাইনস' নাটকটির নায়ক 'নিল' একজন বিপ্লবী শ্রমিক। শ্রমিকশ্রেণী যে পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ার ক্ষমতা রাখে এই অবিচল বিশ্বাস ও চেতনায় সে এবং তার সহকর্মীরা অনুপ্রাণিত। তারা সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করে, তবু হার মানে না।

বিপ্লব যে মানবতার আদর্শকে নতুন স্তরে উন্নীত করে, মানুষের ইতিহাসে বিকশিত শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন মর্যাদায়, সেই সত্যটিকে গোর্কী 'নিল' চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মেকী ও নিষ্ক্রিয় মানবতাবাদকে বর্জন করলেও বিপ্লব কখনই মানবতা-বিরোধী নয় বরং সমগ্র

মানবতার প্রকৃত কল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। এই নতুন সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের পতাকা গোর্কী প্রথম তুলে দিয়েছেন 'নিলে'র এবং তার পরে 'মাদার' উপন্যাসের মা, পাভেল ও তার সহকর্মীদের হাতে।

১৯০২ সালে কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কিকে লিখিত একটি চিঠিতে গোর্কী 'নিল' চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, 'নিল হল এমন একজন মানুষ যার নিজের শক্তি সম্বন্ধে রয়েছে শান্ত আত্মপ্রত্যয় এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জীবনকে পুনর্গঠনের অধিকার সম্বন্ধে অবিচল বিশ্বাস। এগুলির উৎস হল জীবনের প্রতি সুস্থ, বলিষ্ঠ ভালবাসা এবং জীবনের ত্রুটি ও ব্যর্থতাগুলিকে দূর করার জন্য উদগ্র আগ্রহ। সে একজন শ্রমজীবী, সুতরাং জীবন যে কত কঠোর এবং মর্মান্তিক তা ভালভাবেই জানে। তবু সে বিশ্বাস করে যে, জীবনের চেয়ে মহৎ কিছু নেই এবং সেই জীবনকে নিজের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প অনুযায়ী সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। সে সবসময়ই শান্ত, তার চলাফেরা সংযত, ছটফটে হওয়ার বদলে মর্যাদাপূর্ণ। তার কারণ সে সহজাত অনুভূতি থেকেই কথাবার্তা ও কাজে বা চলাফেরায় ততটকুই শক্তি ব্যয় করে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশিও নয়, কমও নয়।'

'মাদার' উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে ঠিক ঐ গুণগুলিই লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে কোনরূপ আস্ফালন বা বাগাড়ম্বর নেই। যে পঙ্কিল পরিবেশে মানুষগুলি জন্ম নিয়েছে তার চিহ্ন তাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট। কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্নিশিখায় স্নান করে তারা শুধু বাইরের পরিবেশের কুৎসিত প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে তাই নয়, নিজেদের অন্তরেও সমস্ত কুসংস্কার, অনগ্রসরতা ও হীনতার প্রভাব থেকে মুক্তি অর্জন করছে। তাদের আত্মার নবজাগরণ হচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে-ওঠা মানুষগুলি নবজন্ম লাভ করছে। বিপ্লবী-চেতনা যে কি-ভাবে মানুষের মনকে স্বার্থপরতার কলুষমুক্ত করতে পারে সেই কাহিনীর অনবদ্য রূপায়ণ দেখতে পাই ঐ উপন্যাসে।

গোর্কী ইচ্ছে করেই পেলাওয়া ভলাসোভা অর্থাৎ 'মা'কে মুখ্য চরিত্রের স্থান দান করেছেন। বিপ্লবী চেতনার আগুনের পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে মা তিনটি বন্ধন কাটিয়ে উঠেছেন—শোষণের, পরিবারের ও ধর্মের বন্ধন। ঐ বইটিতে গোর্কী প্রতিক্রিয়ার রক্ষক ও বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘর্ষকে চিত্রিত করেছেন অমানবিকতা ও মানবিকতার মধ্যে সংঘাতের রূপে।

'মাদার' উপন্যাস সম্বন্ধে ১৯০৬ সালে নিজের পত্নী ইয়েকাতিরানা পেশকোভার নিকটে লিখিত একটি চিঠিতে গোর্কী লেখেন যে, 'বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আরো অনেক গভীর করতে হবে।' ঐ চিঠিতে তিনি 'মা'র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'আমাদের ছেলেরা পৃথিবীর পথে চলেছে—এগিয়ে

চলেছে নতুন সূর্যের, নতুন জীবনের অভিমুখে। তারা সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করেছে।' পরে বিচারের সময় 'মা' পৃথিবীর সমগ্র গতিকে সত্যের অভিমুখে ছেলেদের অভিযান বলে বর্ণনা করেছেন।

কারুর মনে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজসৃষ্টির আগে সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আবির্ভাব হতে পারে না। যুক্তি হিসাবে তারা বলেন যে, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কথাটির প্রচলন ও সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরযুগে। আসলে এই ধারণাটি যান্ত্রিক ও অনৈতিহাসিক। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ রূপায়িত হয়েছে। মতাদর্শের মূল ভূমিকাই হল ভবিষ্যতে যা হবে ইতিহাসের সেই সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে তার অগ্রগমনের পথ প্রদর্শন করা। সাহিত্যও মতাদর্শেরই অঙ্গ।

কোন্‌খানে সমালোচনাত্মক বাস্তবতার সীমানা শেষ হয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ক্ষেত্র শুরু হচ্ছে তা নির্ণয় করার একটি নির্ভুল মাপকাঠি আছে। বাস্তব সম্বন্ধে শিল্পীর নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিচারের জন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। বর্তমান শতাব্দীতে যে-সব মৌলিক পরিবর্তনের উদ্ভব হয়েছে তার ফলে মার্কসের কথায় 'মানবতার প্রাক-ইতিহাসের অবসান এবং ইতিহাসের শুরু' হচ্ছে। কোন লেখক যদি প্রাক্‌-ইতিহাসের অবসান আসন্ন বলে উপলব্ধি করেন অথচ নতুন ইতিহাস-সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দেখতে বা স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি তাঁর প্রত্যয়ের অভাব থাকে, তবে তিনি 'সমালোচনাত্মক বাস্তবতা'র গন্ডীর মধ্যেই বন্দী রয়ে গিয়েছেন। আর যে লেখক বা শিল্পীর বাস্তবদৃষ্টি ভবিষ্যৎ-রচনাকারী শক্তিকে চিনে নিয়ে স্বীকৃতিদান করেছে, তার বিজয় সম্বন্ধে যিনি স্থিরনিশ্চয়, তাঁর বাস্তবতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় উত্তরিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণাটি স্থাণু নয়। সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রগতি ও পরে চূড়ান্ত বিজয়লাভ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কর্মকান্ড ইত্যাদির বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তার বহুমুখী সৃজনপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের প্রবাহ এগিয়ে চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে। গোর্কী নিজেই বিপ্লবোত্তরযুগে 'ক্লিম সামঘিন' নামে যে মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেন সেটি হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের রূপায়ণে আর একটি দিকনির্ণায়ক চিহ্ন।

ঐ উপন্যাসে গোর্কী একদিকে 'সামঘিনবাদ'এর মাধ্যমে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দেউলিয়া চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সামঘিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদের যুগের বুর্জোয়া বাস্তবের প্রতীক।

বুর্জোয়া সমাজের সংকটের আবর্তে ব্যক্তির চরম বিচ্ছিন্নতা তার মধ্যে মূর্ত। অন্যদিকে ঐ উপন্যাসে গোর্কী অংকিত করেছেন ইতিহাসের বিরাট ক্যানভাসে জনগণের বিপ্লবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ও ভবিতব্যের চিত্র। বিপ্লবী গণসংগ্রাম যে-পরিমাণে শক্তিসঞ্চয় করছে ও সুদক্ষভাবে সংগঠিত হচ্ছে সেই পরিমাণে জনগণের চরিত্রে দেখা দিচ্ছে নতুন পরিবর্তন। যে সব নরনারীকে দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত সাধারণ, অতি তুচ্ছ বলে মনে হত তারাও ব্যারিকেড রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসছে। ঐ উপন্যাসটিতে গোর্কীর সৃষ্ট ইতিবাচক চরিত্রগুলির অন্যতম হল বলশেভিক কুতুজভ। কুতুজভও ব্যক্তির 'আত্মিক স্বাধীনতা'র সমর্থক। তবে সে আত্মিক স্বাধীনতা নিজেকে জনগণের ঊর্ধে এক 'অসাধারণ' ব্যক্তিত্বের আসনে বসিয়ে সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না। সেই স্বাধীনতা বিপ্লবের সেবায় আত্মনিয়োগ করে সচেতন-ভাবে। ঠিক তেমনিভাবেই গোর্কী 'বাগাড়ম্বরকারী' বা 'মুহূর্তের উত্তেজনায় চালিত' মেকি বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রামী জনগণের দৈনন্দিন ও জীবনব্যাপী বীরত্বের পার্থক্যের চিত্রটিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট রেখায় অংকিত করেছেন।

'ক্লিম সামঘিন' উপন্যাসটি শিল্পরীতি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। তা অতীতের শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক ঐতিহ্যের সঙ্গে উক্ত নতুন শিল্পরীতির সম্পর্কেরও একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বাস্তবের বৈপ্লবিক বিকাশ তথা জনগণের দ্বারা ইতিহাসের রূপায়ণের মহান আলেখ্য অংকনের শৈল্পিক পদ্ধতির দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ম্যাকসিম গোর্কীর সুবিশাল কীর্তির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা একটিমাত্র প্রবন্ধে করা অসম্ভব। তাই তাঁর জীবন ও শিল্পজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই এখানে করা হয়েছে। তিনি আমাদের হাতে যে নতুন, মহত্তর, বৈপ্লবিক ও সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের পতাকা তুলে দিয়েছেন এবং সেই মানবতাবাদের সার্থক সাহিত্যরূপায়ণের জন্য যে-নতুন শিল্পরীতি সৃষ্টি করে গিয়েছেন তাঁর সেই মহান উত্তরাধিকারকে যেন আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

॥ ৭ ॥

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথিকৃৎ ম্যাকসিম গোর্কি

ম্যাকসিম গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বকে রূপ দিয়েছেন নিজেরই জীবনের সংগ্রাম এবং সন্ধানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আমার মনে হয় যে, সেই তত্ত্বের অংকুরিত হওয়া থেকে শুরু করে রূপায়ণের কাহিনীকে যদি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলেই তাঁর উত্তরাধিকারকে আমরা সত্যিসত্যি কাজে লাগাতে সমর্থ হব।

একথা সুবিদিত যে, যাত্রার প্রারম্ভে তাঁর সামনে লক্ষ্য পরিষ্কার ছিল না। কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদকে আশ্রয় করে তাঁর চলা শুরু হয়নি। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অত্যন্ত কঠিন বেদনাময় জীবনের অংশীদার হিসাবে মুক্তির পথের সন্ধান করতে করতে তিনি সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সচেতন সৈনিকে পরিণত হয়েছেন। নিজের জীবনজিজ্ঞাসাকে সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে তাকে সমাজতন্ত্রের জন্য বিজয়-অভিযানের চির-ভাস্বর আলোকবর্তিকা-রূপে তুলে ধরেছেন। জীবনজিজ্ঞাসা বিকশিত হয়ে উঠেছে সংগ্রামী, বস্তুনিষ্ঠ এবং মহান্ ভবিষ্যতের স্বপ্নে উদ্‌বুদ্ধ শিল্পজিজ্ঞাসায়। এই বিকাশের প্রক্রিয়াটিই সমস্ত দেশে তাঁর উত্তরসাধকদের পক্ষে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির সাধনায় সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

আমাদের দেশে গোর্কির জীবন ও কৃতির নানাদিক নিয়ে নানা জনে অনেক শিক্ষণীয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, উক্ত প্রক্রিয়াটিকে অধ্যয়নের জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা হয়নি। তাই এই দিকটির প্রতি সহকর্মী ও সহযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

গোর্কির মনের উন্মেষ হয় অত্যন্ত কঠোর কুশ্রী ও শ্বাসরোধকারী পরিবেশে সে কথা সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী এবং 'হাউ আই স্টাডিড' ও 'অন বুকস্' নামক প্রবন্ধগুলি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কখনই ঐ পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, প্রয়াস পেয়েছেন পরিবেশের উর্ধ্বে ওঠার। প্রথমদিকে স্বভাবতই বিদ্রোহ ছিল অচেতন। বুকের মধ্যে গুমরে উঠেছে আক্রোশ। বালকের মন চেয়েছে স্নেহ, ভালোবাসা কিন্তু এক দিদিমা ছাড়া আর কারুর কাছেই তা সে পায়নি। ফলে একদিকে নিদারুণ অসন্তোষ, আর অন্যদিকে নিঃসঙ্গ একাকিত্বের বোঝা। এই বিক্ষোভ যদি ঠিক পথ খুঁজে না পেত তবে তার কি পরিণতি হত বলা যায়

না। সুখের বিষয় যে, তা হাতড়ে হাতড়ে হলেও পথের সন্ধান পেয়েছে। দেশবিদেশের সাহিত্য চোখের সামনে উপস্থিত করেছে এমন এক জগতকে যা প্রাত্যহিক পরিচিত পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে এমন সব মানুষকে দেখেছেন যাদের ব্যক্তিত্ব চেনা-মানুষদের থেকে একেবারে আলাদা ছাঁচে গড়া। বইয়ে-পড়া কাহিনীগুলির উপর নিজের কল্পনার রং বুলিয়ে হয়তো নতুন কাহিনী রচনা করেছেন, আশেপাশের মানুষকে তা শোনাতে চেয়েছেন। কেউ বিদ্রূপ করেছে, কেউ-বা বলেছে এগুলি তাঁরই স্বকপোল-কল্পিত। আবার ক্বচিৎ কখনও এমন দুই একজন লোকের সংস্পর্শে এসেছেন যারা তাঁর বই পড়ায় উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন মনের গন্ডিকে প্রসারিত করতে।

গোর্কি বলেছেন যে, বইগুলি যেন তাঁর কানে মানুষের জন্য এক বৃহত্তর জীবনের বাণী শুনিয়ে গিয়েছে। যে দুর্গন্ধ পঙ্ককুন্ড তার মূর্খতা এবং গ্লানির আবর্তে তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছিল সেই পঙ্কের উপরে উঠতে সাহায্য করেছে। প্রত্যেকটি বই যেন ছিল জান্তব জগত থেকে মানুষের জগতে আরোহণের, জীবনকে বুঝবার এবং তার জন্য তৃষ্ণা উদগ্র হয়ে ওঠার এক একটি ধাপ।

কিশোর বয়সে, মনের পাপড়িগুলি যখন সবে বিকশিত হতে আরম্ভ করছে তখন গোর্কীর মত গভীর সংবেদনশীল সক্রিয় মনের কল্পনায় স্বাভাবিকভাবেই রোম্যান্টিকতার আমেজ খুব গাঢ় হয়েই লাগে। হয়ত আত্মরতির মনোভাবটাও থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, গোর্কির রোম্যান্টিকতায় প্রথম থেকে বিদ্রোহের সুরটি স্পষ্ট। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প গোড়া থেকেই বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিনি ভবঘুরেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের চরিত্রকে প্রথম জীবনে রোম্যান্টিক রঙে অঙ্কিত করেছেন। ভবঘুরেদের প্রতি আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তাদের মনে হত পঙ্কে নিমজ্জিত সাধারণ মানুষ-গুলির থেকে আলাদা ধাঁচের মানুষ বলে। নিজ-শ্রেণী বা বর্ণ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে তাদের দেহমন থেকে যেন পুরাতন পটভূমির সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। সমাজের বিরুদ্ধে তাদের একক বিদ্রোহ যে কত ট্রাজিক এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য সেকথা তিনি পরবর্তীকালে উপলব্ধি করেন। কিন্তু প্রথম দিকে ভবঘুরেরা তাঁর কাছে এক অপরিচিত জীবনের হাতছানিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ডে ('পৃথিবীর পথে') আলেক-সাসা নামে একজন ভবঘুরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, 'অনেক নৈরাশ্যময় মুহূর্তে তার ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠত। আমি দেখতাম

যেন সে চলেছে প্রান্তর অতিক্রম করে অথবা ধূসর বনপথ ধরে। আপন মনে বলতে বলতে চলেছে, 'আমি সোজা রাস্তা বেছে নিয়েছি—এই অন্ধকার জগতে আমার কোন স্থান নেই, আমি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেছি।' সাধারণের থেকে ব্যতিক্রমের সন্ধানেই তিনি একবার সশস্ত্র সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত একদল বন্দীর সঙ্গে কথা বলতে ছুটে গিয়েছিলেন।

গোর্কি নিজেও কয়েকবার সমস্ত পিছুটান কাটিয়ে ভবঘুরে হয়ে নিরুদ্দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু জীবনের অমোঘ অভিজ্ঞতা তাঁর বিদ্রোহী মনকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবকে এড়িয়ে পলায়নের বদলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রামের ময়দানে।

বইপড়া তাঁকে মানুষে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন যে, বইতে যা লেখা তা আসলে বাস্তব জীবনেই ছবি। সুতরাং তাঁর অত্যন্ত চেনা পশুপ্রকৃতির ঠিকাদার বা নিজের নিষ্ঠুর প্রভু, মাতাল অফিসার ইত্যাদির থেকে ভিন্ন ভাল মানুষেরও অস্তিত্ব আছে এই জীবনে। তিনি এক বৃদ্ধের কাছে থেকে উৎসাহলাভ করেছিলেন। বৃদ্ধ বলেছিল যে, বাস্তব জীবনে এই ধরণের অর্থাৎ বইতে বর্ণিত ঘটনাও ঘটে; সবরকম ঘটনাই ঘটতে পারে।

সেই সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ কথাটি গোর্কির কাছে অসাধারণ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সবকিছুই যদি ঘটতে পারে তবে তিনি যেমনটি চান তাও ঘটা সম্ভবপর। এই বিশ্বাস তাঁর মনে সাহস ও দৃঢ়তার জন্ম দিয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, ঠিক যে-মুহূর্তে জীবনের কাছে কঠিন আঘাত পেয়েছি তখনই আমার মধ্যে সাহস ও দৃঢ়তা জেগে উঠেছে। মনে তারুণ্যের উৎসাহ এবং হারকিউলিসের মত শক্তি নিয়ে জীবনের সমস্ত আবর্জনার স্তূপ ঝেঁটিয়ে সাফ করার প্রেরণা অনুভব করেছি।

বই পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি শুনতে পেয়েছেন যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার দীর্ঘশ্বাস এবং মানবমন ও হৃদয়ের কাব্য। দেশবিদেশের সাহিত্যে যে-সব ভিন্ন ধরণের আশ্চর্য মানুষ, অট্টালিকা ইত্যাদির ছবি প্রতিফলিত হতে দেখেছেন তা থেকে তাঁর মনে জেগেছে নতুন কিছু গড়ার সংকল্প। ক্রমশ তাঁর চোখে ধরা পড়েছে যে, ঐসব কিছর মূলে রয়েছে মানুষেরই আশ্চর্য সৃজনক্ষমতা।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করতে শিখেছেন যে, বর্তমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর নতুন সুন্দর জীবন গড়ার সংকল্পে তিনি নিঃসঙ্গ নন। প্রায় প্রতিটি বইয়ের পৃষ্ঠা তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলেছে এক অব্যক্ত অনুভূতি, অজানার সন্ধানে ছুটবার আহ্বান। তিনি অনুভব করেছেন যে, সমস্ত মানুষই একভাবে, না-হয় অন্যভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং সন্ধান

করে চলেছে উন্নততর জীবনের। সমস্ত পৃথিবীই যেন সুন্দরতর জীবনের জন্য এক শোকার্ত আকাঙ্ক্ষার আবরণে ঢাকা।

তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে যেমন একদিকে মানবাত্মাকে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের জালে আবন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে তেমনি প্রত্যেক যুগেই হয়েছে এমন সব মানুষের উদ্ভব যারা মানবমনকে মোহমুক্ত করার ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। একদিকে প্রত্যেক যুগেই একদল লোক মানুষকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জিনিস নিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকলে এবং বর্তমানের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে শিক্ষা দিয়েছে। তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেক যুগেই একদল বিদ্রোহী জীবনের কুশ্রী দুঃসহ পরিবেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে, ঐসব বিদ্রোহীরাই মানবতাকে এগিয়ে চলার পথের সন্ধান দিয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরশ্রমভোগীদের স্বার্থে রচিত মিথ্যা, লোভ, পারস্পরিক হিংসা-অবিশ্বাস ও শ্রমবিমুখতার মনোভাবের ঊর্ধ্বে মহাভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামে তারা জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

গোর্কি তাঁর এই সময়ের বিকাশমান ব্যক্তিত্বের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন 'পৃথিবীর পথে' নামক আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ডটিতে। তিনি বলেছেন যে আমার মধ্যে একটা দ্বৈত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। একদিকে আমি ছিলাম জীবনের মর্যাদার বিকৃতি ও লঙ্ঘন সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেজন্য জীবনের প্রাত্যহিক বীভৎসতা আমাকে যেন নুইয়ে ফেলত। আমি জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে খুব সতর্ক ও খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে অনুকম্পার মনোভাব পোষণ করতাম। এমন কি নিজের সম্বন্ধেও। এই ব্যক্তিত্ব চাইত তপস্বীর মত বইয়ের জগতে অথবা কোন মঠে, কিংবা বনরক্ষকের কুটিরে নিজেকে আবন্ধ রাখতে—এমন কি মানুষের সংশ্রব ছেড়ে অনেক দূরে কোথায়ও চলে যেতে।

অন্যদিকে, অপর ব্যক্তিত্বটি অগ্নিদীক্ষালাভ করেছিল মহৎসাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে। দৈনন্দিন জীবনের অভিশাপগুলি কিভাবে মনের শক্তিকে নিঃশেষিত করে নেয়, হৃদয়কে দলিত করে ক্লেদাক্ত পায়ে—সে সম্বন্ধে তা হয়ে উঠেছিল খুবই সচেতন। সেগুলির বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে বলিষ্ঠ বাহু তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইত এই অপর ব্যক্তিত্বটি। এখানে ভালবাসা এবং অনুকম্পার চরিত্র ছিল সক্রিয়, সংগ্রামী। বইতে পড়া শিভালরির যুগের বীরদের মতই তা যেন সর্বদাই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিষ্কাশিত তরবারি হাতে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

বলাবাহুল্য যে, ক্রমশ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি প্রাধান্য লাভ করে। জীবনের পথপরিক্রমায় গোর্কি নিজের এবং অন্যের মধ্যে দেখতে পান একদিকে হৃদয়ের

কন্দরে সহজাত প্রবৃত্তির বিরামহীন অর্থহীন আকৃতি, আর অন্যদিকে কুশ্রী বাস্তবের কারাগারে বন্দী মুক্তির ডানাহীন ঝটপটানি। বাইরের জগতে এবং নিজ অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের আগুনে পুড়ে ইস্পাতের মত কঠিনভাবে গড়ে উঠেছে বাস্তবের উপর বিজয়লাভের সংকল্প। একক নয়, সমবেত সংগ্রাম। তিনি উপলব্ধি করতে শিখেছেন যে, তিনি একা নন, আরো অনেকে আছে তাঁর সঙ্গে। এইভাবেই গোড়ার দিকের স্বপ্নচারী রোম্যান্টিকতা এক বলিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্র গ্রহণ করেছে।

বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপরও ছিল না। সে চেষ্টাও তিনি বিশেষ করেননি। বরং তাকে দেখতে চেয়েছেন সত্যনিষ্ঠ, সম্পূর্ণ ও মোহমুক্ত দৃষ্টিতে। জীবনের যাত্রাপথে যে-সব ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি সত্যের সন্ধানের উৎসাহলাভ করেছেন তাঁদেরই একজন তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'জীবনের ফাটল ও গহ্বরগুলির মধ্যেও খুঁজে দেখ। হয়তো সেখানে সত্যের সন্ধান পেতে পার। যা ভয়ংকর এবং অপ্রিয় তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর না। ভয়হীন জীবনযাপন করতে শেখ। যে জিনিসকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছ তাই তোমার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

তাই আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাগুলিতে তিনি লিখে গেছেন, 'আমি সবকিছুকে দেখতে ও জানতে চেয়েছি। এমন সব জিনিসও খুঁজে দেখেছি যার হয়তো কোন দরকার ছিল না। তবু জীবনের কোন দিককেই বাদ দিইনি।' বস্তুতপক্ষে বাস্তবের কঠিন উলঙ্গ কুৎসিত দিকগুলিকে অনাবৃত করে তুলে ধরতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু বাস্তবের নিছক ফটোগ্রাফধর্মী চিত্রণও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি লিখেছেন যে, 'পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াইতে, বহিঃপ্রকৃতি এবং নিজের অন্তরের উপরে জয়লাভের লড়াইয়ের রুক্ষ কর্কশ নাটকে সবকিছু জানার প্রয়োজন আছে। পৃথিবীতে যদি কোন কিছু মহান ও পবিত্র থাকে তা হল মানুষের অগ্রগতির প্রবাহ। সেই সমগ্র প্রবাহের রূপটিকে বোঝার পক্ষে ঘৃণাযোগ্য মুহূর্তগুলিরও কিছু মূল্য রয়েছে।'

আত্মজীবনীরই অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, 'আমি মানুষকে ভালবাসি। কারুর দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই না। কিন্তু তাই বলে আবেগপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বাস্তবের কঠোরতাকে রামধনুর রঙে চিত্রিত করা উচিত নয়। জীবন ঠিক যেমনটি তাকে সেইভাবে দেখা উচিত। মানুষের হৃদয়ে ও মনে যা-কিছু ভাল এবং মানবিক তাকে সত্যের জ্ঞানের দ্বারা শক্তিশালী করা উচিত।'

কোন কোন সমালোচক গোর্কির প্রথমদিকের সাহিত্যের উপর প্রকৃতিবাদের প্রভাবের কথা বলে থাকেন। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁর বাস্তবতা

ক্রমশই সংগ্রামী বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এই বাস্তবতা ও সংগ্রামী রোম্যাণ্টিকতার মধ্যে মূলগত বিরোধ নেই। একটি অপরটির পরিপূরক রূপে বিকাশলাভ করেছে। তাদের সম্বন্ধ হল দ্বান্দ্বিক ঐক্যের সম্বন্ধ।

গোর্কি গোড়ার দিকের লেখাগুলিতেই এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা জীবনে কোন আঘাতের কাছেই মাথা নোয়ায় না। তিনি যখন বিপ্লবী ছাত্রদের গোপন পাঠচক্রে যোগদান করেন তখন ঐ ছাত্রদের মধ্যে 'জনসাধারণ' বলতে যে বিমূর্ত রোম্যাণ্টিক ধারণা প্রচলিত ছিল তার সমালোচনা করেন। কিন্তু ছাত্রেরা ভবিষ্যতের যে আদর্শনিষ্ঠ স্বপ্নে অনুপ্রাণিত এবং মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টির সংকল্পে উদ্‌বুদ্ধ, তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করেন।

সংগ্রামী রোম্যান্টিকতাকেই তিনি উত্তরজীবনে বিপ্লবী রোম্যাণ্টিকতা সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিষ্ক্রিয় রোম্যাণ্টিকতা মানুষকে শেখায় বাস্তবকে কাল্পনিক রঙীন রঙে চিত্রিত করে তার সঙ্গে আপস করতে অথবা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। আর সক্রিয় বা বিপ্লবী রোম্যাণ্টিকতা মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে, প্রচলিত অবস্থার বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রকম দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করে। গোর্কির মতে সমস্ত মহৎ শিল্পীর দৃষ্টিতে হয়ে থাকে বাস্তবতা এবং সক্রিয় রোম্যাণ্টিকতার সংমিশ্রণ।

সক্রিয় রোম্যাণ্টিকতার চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোর্কি লোককথার ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, আদিমযুগ থেকে মানুষ সংঘশক্তির জোরে প্রকৃতি ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। স্বপ্ন দেখেছে সুন্দর সুখী জীবনের। সেই সংগ্রামে মানুষ সমবেতভাবে দুটি অস্ত্র সৃষ্টি করেছে। সে দুটি হল জ্ঞান এবং কল্পনা। সেদিনের মানুষের শক্তি ছিল খুবই সীমিত, জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ, কিন্তু বাস্তবের উপরে বিজয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় কল্পনা তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। লোককাহিনী-গুলিতে অনেক সময় কল্পনার যে অতিরঞ্জন দেখা যায় তারও উদ্ভব হয়েছে ঐ আকাঙ্ক্ষা থেকে।

প্রাচীনকালের লোককাহিনীর মধ্যে তিনি বড় করে দেখেছেন সামূহিক শ্রম, সংঘশক্তি ও সংঘচেতনা এবং সমবেতভাবে সুন্দর জীবনের জন্য স্বপ্ন, বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে জয়লাভের দুর্জয় সংকল্প। আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে ক্রমশ নিজের সংঘশক্তির উপরে বিশ্বাস অর্জন করেছে। প্রাচীন কাহিনীগুলির মহাশক্তিধর মহানায়কেরা, অর্থাৎ হারকিউলিস, প্রমেথিউস প্রভৃতি হলেন আসলে সেই সংঘশক্তিরই প্রতীক। সমাজের যৌথশক্তি ও যৌথ-জ্ঞানের প্রতিনিধি বলেই তাঁরা দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরেছেন।

গোর্কি বলেন যে, ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে ঐ যৌথ প্রক্রিয়া অর্থাৎ সংগ্রাম, কর্ম ও চিন্তারই ফলশ্রুতি হিসাবে। তা সমগ্র সমাজের ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করেছে। লোককাহিনীতে ভাষার যে সহজ স্বচ্ছন্দ অথচ সুন্দর প্রকাশভঙ্গী, সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত উপমা, চিত্ররূপ ইত্যাদি দেখা যায় সে-সব সম্ভবপর হয়েছে সমগ্র সমাজ একাত্ম হয়ে চিন্তা করত বলে।

সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়ার পর থেকে সংঘচেতনা ক্রমশ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। প্রভুশ্রেণী চেষ্টা করেছে শ্রমজীবী জনগণের মনকে নানা মিথ্যা মোহের জালে আচ্ছন্ন করে ফেলতে। তাই পরবর্তী যুগগুলিতে হার্কিউলিস, প্রমেথিউস প্রভৃতির মত সরল অনাড়ম্বর অথচ মহান অনবদ্য চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু লোককথার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শ্রমজীবী জনগণ কখনই অন্যায়-অবিচারের সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেনি বা সংঘশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেনি। কখনও তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপও নিয়েছে। সেইসব অভ্যুত্থানের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে নতুন নতুন রূপকথা। বীর নায়কদের চরিত্রে আরোপিত হয়েছে পুরাকাহিনীর মহাবীরদের ধরণে সরল অনাড়ম্বর মহাশক্তিধর ব্যক্তিত্ব। আবার অন্য সময়ে তাদের প্রতিবাদ ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রভুশ্রেণীর লোকদের নিষ্ঠুরতা, লোভ, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছে। এই ধরণের লোককাহিনীতে অনেক সময় দেখা যায় যে, জনসাধারণের মধ্য থেকে উদ্ভূত কোন তথাকথিত 'নির্বোধ' (Fool) ব্যক্তির কাছে রাজপারিষদ, মন্ত্রী, ধর্মযাজক, পুলিস ইত্যাদিকে বারবার নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে।

গোর্কি লোককথার ইতিহাসকে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে কোন কোন সমালোচক রোম্যান্টিকতার আমেজটিকেই বড় করে দেখেছেন। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা চলে যে, এই ধরণের রোম্যান্টিকতা জনগণকে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা যোগায়? তিনি বলেছেন যে, যে-সব জনসমষ্টিকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত অনুন্নত বলে মনে হয় তাদের মধ্যে সন্ধান করলে দেখা যায় যে, লোককথা-সম্পদের মাধ্যমে তারা সুন্দর সুখীজীবনের স্বপ্নকে অনির্বাণ দীপশিখার মত জ্বালিয়ে রেখেছে। তাদের জীবনে ওটাই শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া।

গোর্কি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানবতাকে এ-যাবৎ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। তবু মানুষ জীবনের ট্র্যাজেডিকে শিল্পে রূপায়িত করেছে। এই রূপান্তরের চেয়ে মহান আর কিছু নেই। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের চাইতে তার ভয়াল নিষ্ঠুর দিকটির প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করে বলেছেন যে, মানুষ প্রকৃতিকে বশ করার চেষ্টায় তার রূপান্তর সাধন করে চলেছে। সেই চেষ্টারই অঙ্গ ও ফলশ্রুতি হিসাবে প্রকৃতিতে সৌন্দর্য আরোপ করেছে। সৌন্দর্য আসলে মানুষেরই সৃষ্টি। বস্তুত মানবতার সমগ্র ইতিহাসে যা-কিছু মহান ও সুন্দর তার উৎস হল সমবেত শ্রম, সংগ্রাম এবং তার অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যে-সব মহৎ সাহিত্য ও শিল্পকৃতি রচিত হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, ঐ সব কৃতির রচয়িতারা লোককথা তথা লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

গোর্কির সংগ্রামী বা বিপ্লবী রোম্যাণ্টিকতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ তথা ইতিহাসের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মিলনেই রূপ নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব। ১৯২৮ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই সমাজের পরশ্রমভোজীদের স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রের ভাবাদর্শ সেই উপলব্ধিকে স্পষ্ট করে তোলে। ইতিহাসে শ্রমজীবী-মানুষের ভূমিকা এবং তাদের সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে ধারণা—গ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট রূপ।

পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ শুধুমাত্র সমালোচনা বা ক্রুদ্ধ অভিযোগে সীমিত নয়। তাঁর রচনায় ধ্বনিত হতে থাকে পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদের জন্য মেঘমন্দ্র আহ্বান। গোর্কির বাস্তবতা নিছক 'সমালোচনাত্মক' বাস্তবতার পর্যায় অতিক্রম করে নতুন উন্নততর স্তরে উত্তরিত হয়। বর্তমানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ভবিষ্যতের যে-সম্ভাবনা শক্তিসঞ্চয় করে এগিয়ে চলেছে তার প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বোঝা এবং স্পষ্টতর রূপে ফুটিয়ে তোলাই হল এই বাস্তবতার প্রাণবস্তু। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের জঠরে জন্ম নিয়েছে ভবিষ্যতের স্রষ্টা যে-শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা এবং পথ প্রদর্শ-কের ভূমিকা পালন করা। এই পদ্ধতির অর্থ ভবিষ্যৎগণনা বা অলস স্বপ্ন-বিলাস নয়, বায়বীয় আস্ফালনও নয়, আগামীকাল যে-শক্তি অমোঘভাবে বিজয়লাভ করবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দিত করা, তার বিজয়ের প্রস্তুতি-অভিযানের পথকে আলোকিত করে তোলা।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কথাটির প্রচলন হয়েছে আরো অনেকদিন পরে, অক্টোবর বিপ্লবোত্তর কালে। তবে গোর্কির 'মা' উপন্যাসটিতে এই তত্ত্বের রূপরেখাকে পূর্ণাঙ্গভাবে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি। উপন্যাসের চরিত্রগুলি যান্ত্রিক ছকে রচিত নয়। তাদের মুখে কল্পকল্পিত আস্ফালনও শোনা যায় না। রক্তমাংসে গড়া, ভালোমন্দে মেশানো মানুষ তারা। যে পঙ্কিল পরিবেশে

তাদের জন্ম তার বহু চিহ্ন তারা অঙ্গে বহন করে। কিন্তু ঘন অন্ধকারের মধ্যে বসেও তারা আলোকের স্বপ্ন দেখেছে, শুনেছে ভবিষ্যতের আহ্বান। নতুন জীবন-রচনার জন্য সংগ্রামের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সূর্যের আলোর ছোঁয়া লেগে যেমন পদ্মকলির পাপড়িগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি নতুন চেতনার আলোকস্পর্শে ওদের মনের পাপড়িগুলি খুলতে শুরু করেছে। এই পরিণতির প্রক্রিয়াকে গোর্কি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেছেন। নিতান্ত চেনা চরিত্রগুলি কখন যেন পাঠকের অজানিতেই নতুন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গেছে। তারা অসাধারণ বা অস্বাভাবিক মানুষ নয়। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষায় যাচাই হয়ে ধীরে ধীরে অগ্রণী সৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের কথায় ও আচরণে মাঝে মাঝে যেন বিদ্যুৎঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনাগতের স্বপ্ন, অপরাজেয় সংকল্প. সত্যের দীপ্তি, আগামী কালের মানবতার জ্যোতির্ময় আভাস। আর সর্বংসহা ধরিত্রীর মত 'মা' প্রায় নিঃশব্দে এক সরল অনাড়ম্বর অথচ অপূর্ব বীরত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছেন।

'মা' উপন্যাসের কাহিনী সবারই খুব পরিচিত। তবু দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে।

প্রায় গোড়ার দিকে 'মা' যেখানে উক্রানিয়ানকে বলছেন ঃ

> 'I'm learning to read', she said sobbing, 'It's time for me to die, and I'm just learning to read'. 'You must not cry', said the Ukrainian gently. 'It wasn't your fault you lived the way you did, and yet you understand that you lived badly, There are thousands of people who could live better than you, but who live like cattle and then boast of how well they live. But what is good in their lives ?'···Leaning his elbows on the table and looking into the Mother's face with pensive eyes, he continued in an even, flowing voice : 'Only those are men who strike the chains from off man's body and from off his reason. And now you, too, are going into this work according to the best of your ability.'

আর এক জায়গায়, পাভেলের সঙ্গে আন্দ্রের (উক্রানিয়ান) কথোপকথনের কিছু অংশ ঃ

> 'There will come a time, I know, when people will take delight in one another, when each will be a star to

the other, and when each will listen to his fellow as music. The free men will walk upon the earth, men great in their freedom. They will walk with open hearts, and the heart of each will be pure of envy and greed, and therefore all mankind will be without malice, and there will be nothing to divorce the heart from reason. Then life will be one great service to man! His figure will be raised to lofty heights—for to free men all heights are attainable.'

অনাগতের এই স্বপ্নে হয়তো রোম্যান্টিকতার আমেজ আছে। তার দৃষ্টি প্রসারিত সুদূর ভাবীকালে। তবু সে বীজ মাটিরই বুকে অঙ্কুরিত হয়েছে। মুক্তি ও সত্যের জন্য অক্লান্ত সৈনিকের অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃউৎসারিত এই স্বপ্ন শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টির গণ্ডীকে ব্যাপ্ত দেয়, দূর-দিগন্তের নিশানা তুলে ধরে।

অন্যত্র যেখানে সোফিয়া নামে একজন নারীকর্মী কৃষকদের কাছে মুক্তি-আন্দোলনের চরিত্র-ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে গোর্কি যে ছবি এঁকেছেন তা সত্যিই অনবদ্য ঃ

'The steady voice of the woman seemed to echo softly from the remotness of the past. It aroused hope, it carried conviction ; and the company listened in silence to its music, to the great story of their brethren in spirit. They looked into her face, lean and pale and smiled in response to the smile of her grey eyes. Before them the cause of all the people of the world, the endless war for freedom and equality, became more vivid and assumed a greater holiness. They saw their desires and thoughts in the distance, overhung with the dark, bloody curtain of the past, amid strangers unknown to them : and inwardly, both in mind and heart, they became united with the world, seeing in it friends even in olden times, friends who had unanimously resolved to obtain right upon the earth, and had consecrated their resolve with measureless suffering, and shed rivers of their own

blood. With this blood, mankind dedicated itself to a new life, bright and cheerful. A new heart was born on the earth, full of hot striving to embrace all and to unite all in itself.'

আমাদের দেশে যাঁরা শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংগঠনের কাজ করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতায় উপরের ঐ ছবিটির বহু প্রাণবন্ত উদাহরণ পাওয়া যাবে।

পাভেল ও তার সহকর্মীদের পরিচালিত মে-দিবসের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়ে উদ্ধৃতি শেষ করছি :

"The people looked ahead, where the red banner was swinging and streaming in the air. All were saying something and shouting ; but the individual voice was lost in the new song, in which the mournful note was absent. It was not the utterance of a soul wandering in solitude along the dark paths, of melancholy perplexity, of a pallid soul beaten down by want, burdened with fear, deprived of individuality.···In this song there was nothing from the old slavish world. It floated onward and evenly ; it proclaimed an iron virility, a calm threat. Simple, clear, it swept the people after it along an endless path leading to the far distant future.'

'মা' উপন্যাসের কাহিনী তৎকালীন বাস্তবের সীমাকে অতিক্রম করেনি। তবু তার মধ্যে শুনি ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসের বলিষ্ঠ সুর। তাই কাহিনীর পরিসমাপ্তি যেভাবে হয়েছে তা আমাদের মনে হতাশার জন্ম দেয় না। 'মা'র মৃত্যুতে হৃদয় বেদনার্ত হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মা'র কণ্ঠে উচ্চারিত কথা কয়টির সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও অত্যাচারীদের উদ্দেশ্যে ঘৃণাভরে বলি 'You—Poor, sorry creatures'.

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের সচেতন সংগ্রাম যত এগিয়ে চলে ততই তার মহামূল্যবান জীবন্ত অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সে আলোচনার অবতারণার দ্বারা প্রবন্ধকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। তবে শেষ করার আগে এই তত্ত্বের আলোকে শিল্প-সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গোর্কির শিক্ষার কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করি।

গোর্কি তো শুধু তত্ত্বকে রূপায়িত করেননি। নিজের শিল্পসাধনার অভিজ্ঞতার আলোকে তরুণ লেখকদের সামনে সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তাঁকে নিজেকে কঠিন সাধনার দ্বারা সেই প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। আত্মজীবনীতে এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, 'আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় চিন্তার যে আঙ্গিক আয়ত্ত করা যায় সে সুযোগ আমার হয়নি। বহু উপাদান আমি সংগ্রহ করেছি কিন্তু সেগুলিকে আয়ত্ত করার জন্য যে একাগ্র অধ্যয়ন দরকার হয় সেজন্য উপযুক্ত অবসর ছিল না। যে-সব বইতে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি তার সঙ্গে আমার দেখা জীবনের পার্থক্য তথা বিরোধ অনেকসময় আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্রমশ আমি আঙ্গিকের দক্ষতা ও জটিলতাকে আয়ত্ত করেছি কিন্তু তার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থেকেছি। কখনও হয়তো একপেশেমি এসে গেছে। নিজে উজ্জ্বল আশাবাদে বিশ্বাসী হয়েও সহযাত্রীদের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য রুক্ষ সুরে গান গাইতে হয়েছে। পাছে অপরের উপর অবিচার না হয় সেদিকে নজর রাখতে গিয়ে নিজের উপর অবিচার করেছি।'

নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষের ভিত্তিতে তিনি তরুণ লেখকদের সম্মুখে শিল্পী-মানস তথা শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক পথনির্দেশ করেছেন। আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তি যখন সমষ্টির সঙ্গে একাত্মতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে, সমষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন ইত্যাদিকে নিজমানসে ঘনীভূত রূপদানে সমর্থ হয়েছে তখনই তার চেষ্টা ধন্য হয়েছে মহৎসৃষ্টির আশীর্বাদে। সামূহিক অভিজ্ঞতাকে ভাব, উপপাদ্য, তত্ত্ব প্রভৃতি আকারে সুশৃঙ্খল রূপদানেই ব্যক্তির সৃজনশীল ভূমিকা। মানব সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যথাক্রমে সমাজের অবক্ষয় এবং জাগরণের যুগে ব্যক্তির ভূমিকার বৈপরীত্য। অবক্ষয়ের যুগে প্রাধান্য লাভ করেছে ব্যক্তির রক্ষণশীলতা, নৈরাশ্যের প্রবণতা, নিষ্ক্রিয়তা—এক কথায় পৃথিবী সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। জনগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে জনগণের থেকে দূরে সরে থাকার ঝোঁক, তাদের জীবনের প্রতি উপেক্ষা, নিজের জীবনের অর্থ ও যুক্তি সম্বন্ধে উদাসীনতা। অন্যদিকে সামাজিক অভ্যুত্থানের যুগে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় অগণিত মানুষের ইচ্ছার তথা সংকল্পের কেন্দ্রবিন্দু। জনগণ যেন তাকে নিজেদের মনের দর্পণ ও হাতের অস্ত্ররূপে নির্বাচিত করেছে। তখনই ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে শক্তি ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ মহিমায়।

সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য শুধু সমাজ-সচেতনতা, এমন কি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নয়। শিল্পীর পক্ষে বাস্তবকে সৃজনশীল দৃষ্টিতে দেখা চাই। বাইরের জগতে যেমন দুই বিপরীত সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে নিজের অন্তরেও তেমনি অতীতের অবশেষের পিছুটান এবং উদীয়মান নতুনের শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে। তাকেও সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শিল্পী-সাহিত্যিককে গড়ে তুলতে হবে নতুন ধরণের ব্যক্তিত্ব। সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রথম কংগ্রেসে তিনি তরুণ লেখকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে যখন শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ার অধিকার অর্জন করেছে সেই পরিবেশের উপযোগীভাবে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা চাই। ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে খর্ব করার কোন প্রশ্নই ওঠে না বরং তাকে বহুমুখী বিকাশের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। তা সম্ভবপর শুধু সামূহিক শ্রমের পরিবেশে।

ঐ কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলেন :

> 'Socialist realism proclaims that life is action, creativity, whose aim is the unfettered development of man's most valuable individual abilities for his victory over the forces of Nature, for his health and longevity, for the great happiness of living on earth, which he, in conformity with the constant growth of his requirements, wishes to cultivate as a magnificent habitation of mankind united in one family.'

অর্থাৎ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি জীবনকে দেখে কর্মকান্ড রূপে, সৃষ্টিশীল ধারারূপে। এর লক্ষ্য মানুষের মূল্যবান্ ব্যক্তিগত সামর্থ্যগুলির অনিরুদ্ধ বিকাশ সাধন, উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মানুষের বিজয় অর্জন, তার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু, পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ—অর্থাৎ যা মানুষ চায় এবং পৃথিবীকে সমস্ত মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ পরিবারের আবাসভূমিতে রূপান্তরিত করার জন্য মানুষের যে ক্রমবর্ধমান দাবি তার সঙ্গে সেই ইচ্ছার পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে।'*

* এই প্রবন্ধটিতে গোর্কি'র 'আত্মজীবনী' ও 'মা' উপন্যাসটি ছাড়া On Literature নামক প্রবন্ধ সংকলন-গ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত রচনাগুলির সাহায্য নিয়েছি :

1. How I Studied. 2. On Books. 3. How I Learnt to Write.

4. The Disintegration of Personality.

5. Soviet Literature. Address Delivered to the First All-Union Congress of Soviet Writers, August 17, 1934.

॥ ৮ ॥

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বৎসর ও সোভিয়েত সাহিত্যের গতিধারা

সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেল গত মে মাসের ২৩-২৭ তারিখে। এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বৎসরে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয় যে, সেখানে সোভিয়েত সাহিত্যের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার একটা হিসেবনিকেশ হয়েছে কি-না এবং এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করে আজ সোভিয়েত-সাহিত্য কোথায় এসে পৌঁছেছে।

লেখক-কংগ্রেসের আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের দেশে এখনও এসে পৌঁছায়নি। কিছু কিছু তথ্য পরিবেষণ করা হয়েছে সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তাবিভাগের দ্বারা ইংরাজীতে প্রকাশিত 'সোভিয়েত রিভিউ' নামক পত্রিকাটির বিগত ২০শে জুনের সংখ্যায়। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে কংগ্রেসের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, লেখক-কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দনজ্ঞাপক বাণী, লেখক-কংগ্রেসকে 'অর্ডার অফ লেনিন' সম্মানে ভূষিত করা উপলক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান পোদগোর্ণির বক্তৃতা, কে. এ. ফেদিনের উদ্বোধনী ভাষণ, শোলোকেদভের বক্তৃতা এবং কংগ্রেসে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব, বিশ্বের লেখকদের উদ্দেশ্যে আবেদন এবং সমস্ত দেশের সাংস্কৃতিক-কর্মীদের প্রতি আহ্বান ইত্যাদি। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে উক্ত উপাদানগুলি খুবই স্বল্প। কিন্তু সন্ধানী পাঠক একটু উদ্যোগী হলে লেখক-কংগ্রেসের বছর দুই আগে থেকে সোভিয়েত সাহিত্যকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে যে-সব আলোচনা ও মতামত বিনিময় হয়েছে সেখান থেকে আরো বেশী কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। যথা, ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত রুশীয়া যুক্তরাষ্ট্রের লেখকসঙ্ঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত সভাপতির রিপোর্ট এবং অন্যান্য কয়েকটি বক্তৃতা, সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২৩শ কংগ্রেসে সাহিত্যের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা এবং সাম্প্রতিক লেখক-কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে বিভিন্ন লেখক-লেখিকার মতামতের অভিব্যক্তি। মস্কো থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'সোভিয়েত লিটারেচার' নামক পত্রিকাটিতে গত দুই বছর ধরে বিভিন্ন সংখ্যায় ঐ উপাদানগুলি পরিবেষণ করা হয়েছে। সোভিয়েত-সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নের পক্ষে তা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়। তবে সেগুলিকে ঐতিহাসিক

পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করলে সোভিয়েত-সাহিত্যের চরিত্র ও ভূমিকা, বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় এবং গতিধারা সম্বন্ধে একটা রূপরেখা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাছাড়া সোভিয়েত-সাহিত্য সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত সমালোচনাগুলি সম্বন্ধে মতামত গঠন করা সম্ভব হয়।

সোভিয়েত সাহিত্যকে তার জন্মকাল থেকেই একটা প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অভিযোগ করা হয় যে, তা হল 'পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য'। সেখানে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা নেই, পার্টির প্রয়োজনে ও ফরমাইশ-মাফিক সাহিত্যিকদের কাজ করতে হয়। এইধরণের অভিযোগ করা হয়েছে এবং এখনও করা হয়ে থাকে প্রধানত তাঁদেরই পক্ষ থেকে যারা 'শিল্পের জন্য শিল্প'-তত্ত্বে বিশ্বাসী ও শিল্পীর স্বাধীনতার অজুহাতে সামাজিক দ্বন্দ্বের সত্যকে এড়িয়ে চলতে চান। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় বার বার দেখা গেছে যে, এই ধরণের সাহিত্যিকেরা যতই নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুন না কেন, সামাজিক সঙ্কট ও দ্বন্দ্বের তীব্রতাবৃদ্ধির সময়ে এদের অধিকাংশ জানিতে বা অজানিতে প্রতিবিপ্লবের শিবিরে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, যাঁরা 'সমাজসচেতন সাহিত্যে' বিশ্বাসী এবং সাহিত্যকে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সাথী হিসাবে দেখতে চান তাঁদের অনেকের মনেও নানা কারণে বহু প্রশ্ন ও সংশয় রয়ে গেছে।

সোভিয়েত-সাহিত্যের বিরুদ্ধে পার্টি-নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ করা হয় প্রধানত লেনিনের 'পার্টিজান সাহিত্য' বা সাহিত্যের পক্ষভুক্তির তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে। এই প্রশ্নের তত্ত্বগত দিক সম্বন্ধে পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার বিশদ অবতারণার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বলাই সম্ভবত যথেষ্ট হবে যে, লেনিন আক্রমণ করেছিলেন 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ', 'শিল্পীর নিরপেক্ষতা' ইত্যাদি বুলির অজুহাতে সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই ছিল যে, সাহিত্যিককে সচেতনভাবে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সপক্ষে এসে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তিনি সাহিত্যের যান্ত্রিক বর্গীকরণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করেন। সৃজনশীল রচনায় ভাবের প্রাধান্য এবং তা প্রকাশের জন্য সাহিত্যিককে যথোচিত স্বাধীনতা দেওয়া অপরিহার্য বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করে গেছেন।

সোভিয়েত সাহিত্যের চরিত্র ও ভূমিকা

সোভিয়েত লেখকদের চতুর্থ কংগ্রেসে 'সাহিত্যের পক্ষভুক্তি'র প্রশ্নটিকে বলিষ্ঠভাবে এবং সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে। সোভিয়েত

সাহিত্য পক্ষ নেবে কি-না বা কোন্ পক্ষ নেবে সে-প্রশ্নের মীমাংসা তাকে পুঁথিগত গবেষণা বা ড্রয়িংরুমে আলোচনার দ্বারা করতে হয়নি, বা সে অবকাশও পায়নি। বাস্তবজীবনের অমোঘ অভিজ্ঞতাই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। লেখকদের কংগ্রেসের প্রতি সোভিয়েত কমিউনিস্ট-পার্টির কেন্দ্রীয়-কমিটির অভিনন্দন-বাণীতে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত সাহিত্যের জন্মই হয়েছে অক্টোবর-বিপ্লবের অগ্নিশিখার মধ্যে। তার ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের, সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের জন্য সংগ্রামের বিশ্ব-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। তা সচেতন ভাবে নিজ-দেশের ও বিশ্বের জনগণের কাছে সাম্যবাদ, স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির বাণী অক্লান্তভাবে পৌঁছে দিয়েছে ও দিচ্ছে। এইভাবে অক্টোবর বিপ্লব সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন স্তর উন্মুক্ত করে। তার চরিত্র, ভূমিকা, অভিজ্ঞতা সবই এযাবৎকাল-প্রচলিত সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অক্টোবর বিপ্লবের আগের যুগে সংগ্রামী সাহিত্যিকদের রচনার মাধ্যমে এই সাহিত্যের পূর্বাভাষ রচিত হয়েছিল। বিপ্লব, বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সমাজতন্ত্র গঠনের কঠিন বৎসরগুলি, দেশরক্ষার যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন এবং সাম্যবাদ গঠনের কর্মকান্ড ইত্যাদি সোভিয়েত ইতিহাসের সমস্ত সংকটসংকুল অধ্যায়ে সাহিত্যিকেরা সচেতনভাবে সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে সততার সঙ্গে প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব পরিবেশ এবং সাম্যবাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় এক নতুন ধরণের সাহিত্যিক-শিল্পীর জন্ম হয়েছে। তাঁরা সামাজিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, সহযোদ্ধা।

এই সুপরিচিত সত্যটিকে আবার নতুনভাবে তুলে ধরার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। কেন-না যা অতি-পরিচিত এবং স্বতঃসিদ্ধ তার কথা অনেকসময় আমরা ভুলে যাই। অথচ সোভিয়েত-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি, চরিত্র ও ভূমিকার কথা বাদ দিয়ে 'বিশুদ্ধ শিল্পে'র মাপকাঠিতে তার মূল্যবিচার করতে বসাটা নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রশ্নটির নিষ্পত্তিও বৃহত্তর অর্থে ইতিহাসই করে দিয়েছে। লেখক-কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতায় শোলোকোভ লেনিনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ১৯২১ সালে মিয়াসনিকভ প্রস্তাব করেছিলেন যে, রাজতন্ত্রী থেকে নৈরাজ্যবাদী, সকলের জন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হোক। লেনিন তার উত্তরে বলেন যে, 'সমস্ত মার্কসবাদী এবং শ্রমিকেরা আমাদে

বিপ্লবের চার বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্ন করবে যে, 'সংবাদপত্রের কোন্ স্বাধীনতা?' 'কিসের জন্য এবং কোন্ শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতা?' আমরা বিমূর্ত চরমে বিশ্বাস করি না এবং 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে'র ধারণা আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়।'

অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষ যখন নতুন সমাজগঠনের জন্য প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে নিযুক্ত তখন বিপ্লবের শত্রুদের স্বাধীনতা-দানের প্রশ্ন ওঠে না। আজকার সোভিয়েত সমাজেও এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কমেনি। নিকোলে পোদগোর্নি, শোলোকোভ, চাকোভস্কি প্রমুখের বক্তৃতায় বলা হয় যে, স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা প্রচার বা তরুণ-মনকে বিষাক্ত করে তোলার প্রচেষ্টাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। 'লিতারে-তুর্ণায়া গেজেতা' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক চাকোভস্কি বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্য-বাদী ও সাম্যবাদী ভাবধারার মধ্যে অত্যন্ত তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমাদের শত্রুরা 'সেতু রচনা'র কৌশল অবলম্বন করেছে। যদিও সামনা-সামনি আক্রমণের কায়দা তারা পরিত্যাগ করেনি তবু তারা নানারকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। নিকোলে পোদগোর্নিও তাঁর ভাষণে বলেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের মন জয় করার জন্য কঠিন সংগ্রাম চলেছে। আমাদের আদর্শগত শত্রুরা জানে যে, সমাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করে চলা বা তার বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক জয়লাভ সম্ভব নয়। তাই তারা সোভিয়েত জনগণকে আদর্শ-গত ও নৈতিক দিক থেকে নিরস্ত্র করার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে হেয় করার কৌশল নিয়েছে। শোলোকোভ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেন, যখন মার্কিন আক্রমণকারীরা ভিয়েতনামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, যখন পশ্চিম জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ পুনরায় মাথা তুলেছে এবং গ্রীসে ফ্যাসিস্ট চক্র ক্ষমতা দখল করেছে, যখন সমগ্র বিশ্ব উদ্বেগে ছেয়ে গেছে—সেই অবস্থায় 'রাজতন্ত্রী থেকে নৈরাজ্যবাদী' সকলের জন্য 'স্বাধীনতা' দাবী করার অর্থ কি হতে পারে? সেটা কি সন্ত-সুলভ সরলতা, না সচেতন নির্লজ্জতা?

সাহিত্যিক-শিল্পীর স্বাধীনতাকে পরিবেশ-নিরপেক্ষ, সমাজ-নিরপেক্ষ ও বিমূর্তভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে না। সেদিক দিয়ে লেখক-কংগ্রেসে প্রশ্নটিকে সঠিকভাবেই পুনরায় উত্থাপন করা হয়েছে। তবে উপরোক্ত শর্তটি মেনে নেওয়ার পরও অন্যদিক থেকে বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন থেকে যায়। অর্থাৎ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের চরিত্র ও ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে-সব সাহিত্যিক—তাঁদের সৃজনশীল রচনার স্বাধীনতা কতখানি থাকবে?

প্রশ্নটি ওঠে এইজন্যই যে, লেনিনের তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে

বারবার ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে এবং নতুনভাবে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করতে হয়েছে। ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-লেখকদের প্রথম-কংগ্রেসে পার্টি-নেতৃত্বের পক্ষ থেকে লুনাচারস্কী এবং সোভিয়েত-সাহিত্যের পথিকৃৎ ম্যাকসিম গোর্কি সাহিত্যিকদের ভূমিকা ও সৃষ্টির সুযোগ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপিত করেন। তাঁরা বলেন যে, সাহিত্যে পার্টি-নেতৃত্বের অর্থ ফরমাইশ বা ফতোয়া দিয়ে রচনা করানো নয়। সে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে নৈতিক দিক থেকে, সাহিত্যিকের সামনে সামাজিক কর্তব্যের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতকে ফুটিয়ে তুলে। গোর্কি বলেন যে, লেখকদের প্রতিভা বহুমুখী হওয়া চাই এবং ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে অবাধ বিকাশের সর্বোত্তম সুযোগ দিতে হবে। তবে সেই সঙ্গেই লেখকদের মনে রাখতে হবে সমাজের প্রতি তাঁদের যৌথ দায়িত্বের কথা।

মোটের উপর, একদিকে লেখকের সামাজিক-দায়িত্ব ও যৌথ-কর্তব্য এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা—দুইয়ের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে দিয়ে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে। কিন্তু সবসময় তা হয়নি, বিশেষত স্তালিনী-ব্যক্তি-পূজা যখন চরমে উঠেছিল তখন যে ঐ সমন্বয় লঙ্ঘিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সামাজিক কর্তব্যের নামে অনেকসময় সৃজন-শীলতাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম যুগে দেখা দেয় ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়া। তখন কিছুসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে পার্টি-নেতৃত্বকে একেবারে অস্বীকার করার ঝোঁক দেখা যায়। এমন কি, একদল তরুণ-সাহিত্যিকের মধ্যে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি উপেক্ষা করার প্রবণতা দানা বেঁধে ওঠে। সেই সুযোগে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অবক্ষয়ী সংস্কৃতির কিছু কিছু ক্লেদ বাইরের চেহারার চটকের জোরে সোভিয়েত-সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এই প্রক্রিয়াটি যে একেবারে তুচ্ছ করার মত ছিল না তা লেখক-কংগ্রেসের আলোচনা থেকেও বোঝা যায়।

সুতরাং উপরোক্ত সমন্বয় অর্থাৎ পার্টি-নেতৃত্ব, লেখকের সামাজিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রশ্নটি নতুন-ভাবে উত্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখকসংঘের বিগত কংগ্রেসে সভাপতির রিপোর্টে লিওনিদ্ সোবোলেভ বলেন যে, 'মতাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলার অর্থ হল মার্কস-লেনিনবাদের তথা শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সুতরাং যারা সম্প্রতি 'সাহিত্যে নিরপেক্ষতা', 'সৃষ্টির অবাধ স্বাধীনতা', 'বিভিন্ন পুরুষের মধ্যে সংঘাত', ইত্যাদি বুলির আড়ালে পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ী ভাবধারা আমদানী করায় সচেষ্ট, তাদের প্রতি ধিক্কার জানাতে হয়।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট-পার্টির বিগত ত্রয়োবিংশতি কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক ব্রেজনেভ উপরোক্ত সমন্বয়ের প্রশ্নে পার্টির সাধারণ দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েত সমাজজীবনে পার্টি ঐতিহাসিক কারণেই যে ভূমিকা পূরণ করছে সে কথাটি মনে রাখলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।

ব্রেজনেভ বলেন যে, পার্টি সবসময়েই সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও শিল্পীদের সৃজনশীল কাজে নেতৃত্ব দান করেছে এবং করবে। এই নেতৃত্বের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পার্টি কখনই সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত প্রশ্নে প্রশাসনিক কায়দায় জবরদস্তিমূলক সমাধানের চেষ্টা সমর্থন করে না। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, আমরা সাহিত্যে পার্টিজ্ঞান-মনোভাব বা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের নীতিতে অবিচল থাকব।

সমাজতান্ত্রিক-সাহিত্য আশাবাদী। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের জয় সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহের লেশ থাকতে পারে না। কিন্তু এই অত্যন্ত সঠিক সূত্র-টিকে যান্ত্রিক ও বিকৃতভাবে প্রয়োগের চেষ্টার ফলশ্রুতিস্বরূপ সোভিয়েত সমাজবাস্তবের যে-চিত্র প্রতিবিম্বিত হত তা বহুক্ষেত্রে একদেশদর্শী। বাস্তবের নেতিবাচক দিক, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা যেন অপরাধ বলে বিবেচিত হত। এই বিষয়টির প্রতিও ব্রেজনেভ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, আমাদের অনেক ত্রুটি আছে, সম্মুখে রয়েছে বহু কঠিন সমস্যা। সাহিত্যে সেইসব জিনিসের সত্যনিষ্ঠ সমালোচনা আমাদের কাজে সহায়ক হবে।

বাস্তবের সত্যনিষ্ঠ প্রতিফলন আর সমালোচনার নামে সোভিয়েত সমাজ সম্বন্ধে বিকৃত ও কালিমালিপ্ত চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যারা সমালোচনার নামে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে তাদের কাজকে কোনমতে সমর্থন জানানো চলে না। সেরকম ঘটনাও সাম্প্রতিক সোভিয়েত-সাহিত্যে ঘটেছে। তাই ব্রেজনেভকে ঐ ধরণের অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে হয়।

সোভিয়েত লেখকেরা উপরোক্ত সমন্বয়সাধনের কর্তব্যকে মোটেই অতি সরলীকৃত ভাবে দেখেন নি। সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষসাধনের প্রশ্নটিকেও আদৌ অতি সরলীকৃত ছকে দেখা হয় নি। ২৩শ পার্টি-কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখকসংঘের সাধারণ সম্পাদক গিওর্গি মারকভ এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, একে ত সোভিয়েত সাহিত্যিকদের কাজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক গঠনসম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জটিল পরিবেশে এবং বুর্জোয়া মতবাদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তার উপরে বিংশতি কংগ্রেসের পর অনেক পুরাতন ধারণা, সিদ্ধান্ত, ছক ইত্যাদি ভেঙ্গে

পড়েছে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক লেখকের পক্ষে বাস্তবজীবনকে তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বঘটনাপ্রবাহের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও গভীর ধারণা অর্জন করতে হবে। সোভিয়েত-মানুষের আত্মিক বা মানসিক চরিত্রের নতুন দিকগুলিকে বুঝতে হবে গভীর সংবেদনশীলতার সাহায্যে। অতএব লেখকদের নাগরিক ও শৈল্পিক উভয় দিকেই যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জনে প্রয়াসী হওয়া চাই। তিনি বলেন যে, কাজটি মোটেই সহজ নয়। যথেষ্ট সততার সঙ্গে চেষ্টা সত্ত্বেও সকলে এবিষয়ে যথোচিত সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। সাম্প্রতিককালে এমন অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে সমসাময়িক সমস্যাগুলির গভীর বিশ্লেষণের স্থান নিয়েছে ভাসা-ভাসা বর্ণনা, একদেশদর্শিতা অথবা বুর্জোয়া শিল্পরীতির অনুকরণ। এইসব রচনাতে সমাজ-বাস্তবের বিকৃত চিত্রই পরিবেষণ করা হয়েছে। লেখক হয়ত নিজের খুশীমাফিক বাস্তবের একটিমাত্র দিককে সমকালীন জীবনের মূলপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তুলে ধরেছেন। তার দ্বারা যুগসত্যের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

কিছুদিন আগে সাহিত্যে এমন এক ধরণের তরুণদের চিত্রিত করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল যাদের জীবনে কোন স্থিতি নেই এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে চেতনা খুব অনুন্নত। অথচ কিছুসংখ্যক লেখক ঐসব বাউণ্ডুলে তরুণদেরই নাগরিক-বিবেকের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাস্তবজীবনে ঐ ধরণের কিছুসংখ্যক তরুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং তাদের সমস্যাটিকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টাও করা উচিত, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই সোভিয়েত তরুণ-তরুণীদের বিশাল-বৃহত্তম অংশের প্রতিনিধি নয়। সোভিয়েত তরুণ-তরুণীরা ফলপ্রদ ও বীরোচিত শ্রমে নিযুক্ত। তাদের জীবন মহান তাৎপর্য ও সারগর্ভ ঘটনায় পূর্ণ। উক্ত লেখকেরা বাউণ্ডুলে যুবকদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করার পরিবর্তে তাদেরই প্রাধান্য দিয়ে সমকালীন বাস্তবের বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। তার দ্বারা সোভিয়েতের আদর্শগত বিরোধীদেরই সাহায্য করা হয়েছে।

লেখকদের দ্বৈত কর্তব্যের বিচারে সাহিত্যসৃষ্টির জটিল প্রক্রিয়ায় সঠিক ভূমিকা পূরণের জন্য মতাদর্শগত শিক্ষা ও মার্কস-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কর্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মারকভের মতে এই কর্তব্যের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়েছিল।

কিছুকাল ধরে সোভিয়েত সাহিত্যে বীর-চরিত্রের চিত্রণ উপেক্ষিত হয়েছিল। তার বদলে প্রচলিত হয় de-heroisation-এর তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তিরূপে বলা হত যে, বাস্তবজীবনের স্রোত পরিচালিত হয় অখ্যাত অজ্ঞাত গড়পড়তা রোম্যান্টিকতা-বর্জিত মানুষদের কাজের মাধ্যমে। সুতরাং একজন বীরের

বদলে সেইসব মানুষদেরই সাহিত্যে প্রাধান্য দিতে হবে। বলাবাহুল্য যে, ব্যক্তিপূজার প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা থেকেই ঐ যুক্তির উদ্ভব। ১৯৬৫ সালে রুশীয় লেখক-সংঘের অধিবেশন-কাল থেকে সোভিয়েত সাহিত্যিকেরা de-heroisation-তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ঐ অধিবেশনে সভাপতির রিপোর্টে সোবোলেভ খুব সফলভাবেই উক্ত তত্ত্বের সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলি খন্ডন করেন। তিনি বলেন যে, সাহিত্যের বীরচরিত্র প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের সামূহিক সত্তারই শিল্পগত প্রতিরূপ। সাহিত্যে বীরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে জনগণের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলিই ঘনীভূতভাবে প্রকাশ পায়। জনগণের যে-সব সন্তান বাস্তব-জীবনে অসাধারণ গুণের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে উপেক্ষা করা হবে কোন্ যুক্তিতে? জীবিত বীরেরাই ত de-heroisation-তত্ত্বের মোক্ষম জবাব। সোভিয়েত-লেখকসংঘের সাম্প্রতিক কংগ্রেসের কয়েকজন বক্তা অনুরূপ মত ব্যক্ত করে বলেন যে, de-heroisation-এর তত্ত্ব সোভিয়েত-সাহিত্যে বিজাতীয় জিনিস, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নীতির সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

উপরের বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সোভিয়েত সাহিত্যিকেরা যুগপৎ দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতি অর্থাৎ যথেচ্ছাচার এবং যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নতুনভাবে শুরু করেছেন। সম্প্রতি কমিউনিস্ট-আন্দোলনের অতি-বাম সোভিয়েত-বিরোধী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, সোভিয়েত-সাহিত্য তার সংগ্রামী শ্রেণীচরিত্র হারিয়ে ফেলেছে এবং ধনতান্ত্রিক-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রভাব না-কি তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে ইত্যাদি। এই ধরণের প্রচার যে কতখানি বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত তা সোভিয়েত সাহিত্যিকদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

সাহিত্যের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা

সাহিত্যসৃষ্টির জটিল ও বহুমুখী প্রক্রিয়াকে অধ্যয়নের দিকে সোভিয়েত লেখকরা যে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছেন তা প্রাক্-কংগ্রেস আলোচনা-চক্রগুলির বিবরণ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কংগ্রেসের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক-কংগ্রেসের প্রতি কমিউনিস্ট-পার্টির কেন্দ্রীয়-কমিটির অভিনন্দন-বাণীর কথাই ধরা যাক। সেখানে শুধুমাত্র লেখকদের রাজনৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অর্থাৎ পঞ্চভুক্ত, বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, শ্রমজীবী-জনগণকে দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, সাম্যবাদী সমাজের উপযোগী নতুন মানুষ গঠন ইত্যাদির জন্য আহ্বান জানিয়েই কাজ শেষ করা হয় নি।

সাহিত্যসৃষ্টির কতকগুলি মৌল সমস্যাকেও তুলে ধরা হয়েছে। সোভিয়েত-সাহিত্যের বিকাশ এবং শ্রমজীবী-জনগণের নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার কাজে মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। Problems of Literature নামক পত্রিকার সম্পাদক ভি. ওজেরভের বক্তৃতার যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, সাম্যবাদী সমাজের উপযোগী সাহিত্য-সৃষ্টি-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা নিয়েই কংগ্রেসে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন যে, সোভিয়েত-লেখকরা বর্তমানে সমাজ-জীবনের গভীরে অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের কাজে আত্মনিয়োগ কারছেন। কংগ্রেসে আলোচনার জন্য যে-সব বিষয়ের উপর রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়েছিল তার উল্লেখ থেকেও আমরা আলোচনার ধারা সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। যথা ঃ (ক) সাম্যবাদী সমাজ-গঠনে সোভিয়েত সাহিত্য (খ) আমাদের কাল এবং গদ্যের সমস্যা (গ) কবিতা, নাটক এবং শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে রিপোর্ট (ঘ) সাহিত্য-সমালোচনা এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে রিপোর্ট ইত্যাদি।

সোভিয়েত-লেখক-সঙ্ঘের পর্ষদের প্রথম সম্পাদক কনস্তান্তিন ফেদিনের উদ্বোধনী বক্তৃতাটিতে সোভিয়েত-সাহিত্যের বিকাশের ধারা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সোভিয়েত-সাহিত্যের একেবারে প্রথমযুগে তার সামনে কি-ধরণের সমস্যা ও কর্তব্য উপস্থিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ দিয়ে তিনি বক্তৃতা শুরু করেন। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও তা ঐ যুগের সমস্যার উপর নতুন আলোকপাত করে। তখন বিপ্লবে জয়যুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর সামনে একদিকে অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আয়ত্ত করা এবং অন্যদিকে নিজস্ব সংস্কৃতি-সৃষ্টির দ্বৈত-কর্তব্য দেখা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের মধ্য থেকে নতুন ধরণের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক সৃষ্টির কাজে ব্রতী হতে হয়েছে। কেন-না পুরাতন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই প্রতি-বিপ্লবের শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের মধ্য থেকে উদ্ভূত লেখকেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত হন। স্বভাবতই গোড়ার দিকে তাঁরা অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে কোন একটি সুসমঞ্জস যোগসূত্র খুঁজে পাননি। তাঁদের নিজেদের মধ্যেও নানা রকমের ঝোঁক এবং ভুলত্রুটি দেখা দিয়েছিল। লেনিন ও গোর্কীর নেতৃত্বে ক্রমশ এই ঝোঁকগুলি একটি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পায়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাও দিকনির্ণয়ে সাহায্য করে। সোভিয়েত-জীবনের তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে সেইসব বিক্ষিপ্ত লেখক-সংগঠন ও সাহিত্যিক-ঝোঁকগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় মঞ্চে মিলিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখকদের প্রথম কংগ্রেস সংগঠিত হয়। ফেদিনের মতে আজকার সোভিয়েত-সাহিত্যের

বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সঠিক মতামত গঠনের জন্য সেই ইতিহাসের পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন যে, সাহিত্যের ইতিহাসও জনগণের ইতিহাস, তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাহিত্যের ইতিহাসও তার বিভিন্ন পর্যায়ে নিজস্ব সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, চড়াই-উৎরাই-পথ অতিক্রমণের এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক ও মতসংঘাতের কাহিনী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ।

সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের চরিত্র ও ভূমিকার কাঠামোর মধ্যে সাহিত্যিকের সৃজনমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিষয়-নির্বাচন, আঙ্গিক ইত্যাদির স্বাধীনতার প্রশ্নটিও আলোচিত হয়েছে। প্রাক্-কংগ্রেস আলোচনাচক্রের এবং কংগ্রেসের আলোচনার রিপোর্ট থেকেও তা জানা যায়। 'লিতারেতুর্ণায়া গেজেতা'র প্রধান সম্পাদক চাকোভস্কি বলেন যে সোভিয়েত, সাহিত্যিকদের কাছে কোন বিষয়ই নিষিদ্ধ নয়। তাঁরা শান্তির সময়ে কঠিন পরিশ্রমে এবং যুদ্ধের নিদারুণ বৎসরগুলি কাজের মাধ্যমে সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তরুণ লেখকদের নানারকম পরীক্ষ-নিরীক্ষা করার অধিকার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্যদানের কথা তিখোনোভ প্রমুখ কয়েকজন বক্তাই উল্লেখ করেন। ১৯৪০ দশকে যে তরুণদের জন্ম হয়েছে তাদের শিক্ষার প্রশ্নটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অক্টোবর-বিপ্লব বা দেশপ্রেমিক-যুদ্ধ কোনটিরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাদের নেই। সুতরাং তাদের নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার কাজে সোভিয়েত-সাহিত্যকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের সম্বন্ধের বিষয়ে কয়েকজন বক্তার, বিশেষত শোলোকোভ ও তিখোনোভের মধ্যে, মতভেদ আছে বোঝা যায়। তবে সে প্রসঙ্গটি আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে খুব জরুরী নয় বলে তার বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

বহু-জাতিক সাহিত্য

কংগ্রেসে সোভিয়েত-সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার বহু-জাতিক চরিত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই বহু-জাতিক সাহিত্যে সোভিয়েত-ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতিসত্তার ঐতিহ্যের প্রগতিশীল ও জীবন্ত উপাদানগুলি এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির পথে প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। কমিউনিস্ট-পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দন-বাণীতে উক্ত দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখক-সঙ্ঘের সভাপতি সোবোলেভ বহু-জাতিক সোভিয়েত-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাল্‌টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে

৭৪টি জাতিসত্তা ৫৭টি ভাষায় সাহিত্য রচনা করছে। বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী, বাস্তবকে শিল্পে রূপায়ণের মূল পদ্ধতি, সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও জনগণের প্রতি বিশ্বস্ততা হল এইসব সাহিত্যের মৌল ঐক্যসূত্র।

উপরোক্ত জাতিগুলির মধ্যে অনেকেই লিপি ও লিখিত-সাহিত্য লাভ করেছে অক্টোবর-বিপ্লবের পরে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদের অনেকের সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উন্নত পর্যায়ে এসে পেঁাছেছে। একদিকে রুশ-সাহিত্যের ও তার মাধ্যমে বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এদের জন্য। অন্যদিকে অ-রুশীয় জাতিসত্তাগুলির বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদ, অভিজ্ঞতা, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি বর্তমানের সোভিয়েত সাহিত্যকে বহু বর্ণে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

বহু-জাতিক চরিত্র যেমন সোভিয়েত-সাহিত্যকে বিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি তার সামনে উপস্থাপিত করেছে নতুন সমস্যা ও কর্তব্য। চাকোভস্কি তাঁর বক্তৃতায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রত্যেক জাতিসত্তার আত্মিক সম্পদের বিকাশের প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা সাম্প্রতিক সোভিয়েত সাহিত্যের একটি মৌল কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। কনস্তান্তিন ফেদিন বলেন যে, ঐসব জাতির মধ্যে সোভিয়েত সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশের অত্যাশ্চর্য ঘটনার ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জাতীয় ভাষাই জনগণের হৃদয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের তাৎপর্য এবং নয়া দুনিয়া গঠনের প্রেরণা সঞ্চার ও উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে সর্বোত্তম মাধ্যম। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখক-সঙ্ঘের কংগ্রেসেও সোবোলেভ এই প্রসঙ্গটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। বহু-জাতিক চরিত্রটিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার সমস্যাগুলির মধ্যে তিনি প্রধান স্থান দেন অনুবাদের সমস্যাকে এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সারা পৃথিবীর অনুবাদ-সাহিত্য বিশেষত অনুবাদকদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। তাঁর মতে প্রথমত, অনুবাদক ও মূল লেখকের জীবন-দৃষ্টি, শিল্পদৃষ্টি ও রুচির মধ্যে যদি মিল থাকে তবেই অনুবাদক মূল রচনার প্রাণবস্তুটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে নিজ-ভাষায় জীবন্ত করে তুলতে পারেন। অথাৎ মূল লেখকের ভাবসম্পদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে তার মধ্যে বিলীন করে দিতে পারলে সত্যিকারের সফল অনুবাদ সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সার্থক অনুবাদের সমস্যাটি শুধু ঐটুকুর মধ্যে সীমিত নয়। যে-জাতির সাহিত্য অনুবাদ করা হবে তার প্রতি যদি অনুবাদকের গভীর মমত্ববোধ থাকে, তিনি যদি সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমকালীন জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হন, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি তাঁকে মুগ্ধ করে থাকে, এক কথায় অনুবাদক যদি সংশ্লিষ্ট জাতির জনগণের

মরমী বন্ধু হিসাবে তার সাহিত্যের সম্ভাবনার প্রতি দায়িত্ব বোধ করেন তবেই তাঁর প্রয়াস পরিপূর্ণ সার্থকতালাভ করবে। উক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে সোবোলেভ সাহিত্যের এক একটি অগ্রগতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার সময় রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অ-রুশীয় জাতিসত্তার সাহিত্যের কথাও উল্লেখ করেন।

সোভিয়েত-সাহিত্যের বহু-জাতিক চরিত্র গত কিছুকাল ধরে 'সোভিয়েত লিটারেচার' পত্রিকাটিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আত্মসমীক্ষার উদ্যোগ

সোবোলেভের উক্ত রিপোর্টটিতে সমকালীন সোভিয়েত-সাহিত্যের, বিশেষত রুশভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যের, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে 'সোভিয়েত লিটারেচার' পত্রিকার ১৯৬৫ সালের ৭নং সংখ্যায়। উৎসাহী পাঠকেরা খুঁজে নিতে পারেন।

সোবোলেভের ঐ রিপোর্ট থেকে শুরু করে লেখক-সঙ্ঘের প্রাক্-কংগ্রেস-আলোচনা এবং কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে সঙ্গতভাবেই মনে করা যায় যে, সাম্প্রতিক সোভিয়েত-সাহিত্য আত্মসমীক্ষার কাজে সামগ্রিকভাবে মনোনিবেশ করেছে। সুতরাং বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব। সোবোলেভ বলেছেন যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক হল কাল। কোন্ কোন্ সাহিত্যকৃতি চিরায়তরূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য তা একমাত্র কালের নিরিখেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমকালীন-সাহিত্য সম্বন্ধে ত সে নিরিখ প্রযোজ্য নয়, অথচ তার মূল্য বিচার না করে বসে থাকা চলে না। সোভিয়েত লেখকেরা যখন মানুষের মনকে আলোকিত করে তোলার এবং সাম্যবাদী শিক্ষা-দানের দায়িত্ব সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন তখন সমকালীন সাহিত্যের বিচারের ভারও যৌথভাবে তাঁদেরই নিতে হবে। সমগ্র মানবতার কল্যাণের আদর্শে তাঁরা যা সৃষ্টি করে চলেছেন তার গুণাগুণ বিচারের জন্য নিজেদেরই একটি Quality Inspection Department গড়ে তুলতে হবে। লেখকদের নৈতিক আচরণ-বিধির সর্বপ্রথম সূত্র হওয়া চাই: ভবিষ্যতের নামে বর্তমানের জন্য সৃষ্টি এবং বর্তমানের সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টি। লেখকদের সমস্ত কাজে, প্রেরণায়, চিন্তায়, সঠিক প্রকাশভঙ্গীর সন্ধানে ও শব্দচয়নের কঠিন প্রয়াসে অর্থাৎ নিজেদের দেশ এবং যুগ সম্বন্ধে সচেতন সাধনার সমগ্র মর্মবস্তু যেন ঐ লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়। ঐ সুরটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে Problems of Literature পত্রিকার সম্পাদক ভি. ওজেরভের বক্তৃতায়।

তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য-সমীক্ষা যেন 'সত্যের জন্য যৌথ সন্ধান'-রূপে কাজ করে এবং বিতর্ক যেন সৃজনশীল চিন্তার প্রেরণা যোগায়।

সোভিয়েত সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ভূমিকা

কংগ্রেসে সোভিয়েত সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ভূমিকার প্রশ্নটি নানাভাবেই উত্থাপিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দন-বাণীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে এবং ফ্যাসিজম সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত লেখকদের সক্রিয় ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন আন্তর্জাতিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্ররোচনা সৃষ্টি করছে তখন তার বিরুদ্ধে সোভিয়েত লেখকেরা বিশ্বের অন্য সমস্ত সৎ মানুষের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদ জানাবে। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-সব সুস্থ শক্তি শান্তি ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় যে, সেই ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলা হবে সোভিয়েত লেখকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

কংগ্রেসে অনেক বক্তাই বলেন যে, ইউরোপে নতুনভাবে ফ্যাসিজমের অভ্যুদয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্ররোচনা ও নয়া-উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র বিশ্বশান্তির পক্ষে গুরুতর বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩০ সালে গোর্কী সমস্ত সৎ লেখক ও শিল্পীর কাছে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন 'আপনি কার পক্ষে' সেই প্রশ্নটি আজও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বের মঞ্চে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে সোভিয়েত লেখকরা উদাসীন থাকতে পারেন না। তাই লেখক-সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে একটি বিশেষ ধারা সংযোজনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। সেই ধারা অনুসারে লেখকসঙ্ঘ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গে একযোগে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন।

ভিয়েতনাম ও গ্রীসের সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধি বক্তৃতা করতে উঠলে সমগ্র কংগ্রেসের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। ২৫-মে তারিখটি আফ্রিকার জনগণ তাদের মুক্তি-দিবস হিসাবে পালন করে, তাই ঐ তারিখটির অধিবেশনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আফ্রিকার জনগণের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করা হয়। আর একজন সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধির বক্তব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন European Community of Writers বা সংক্ষেপে COMES নামক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক গিয়ানকার্লো ভিগোরেল্লি।

ভিগোরেল্লি বলেন যে, বর্তমানের জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ভিয়েতনামের যুদ্ধকে সম্প্রসারণের চেষ্টার ফলে যখন বিশ্বশান্তি বিপন্ন তখন COMES-এর কার্যকলাপ ক্রমশ অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করছে।

লেখক-কংগ্রেসে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটিতে গ্রীসে ফ্যাসিস্টশাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং ১৯৩৪ সালে স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ রণধ্বনি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, ফ্যাসিজমকে এগোতে দেওয়া হবে না। অপর একটি প্রস্তাবে ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনগণের প্রতি পূর্ণ-সমর্থন এবং অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

'বিশ্বের সমস্ত লেখকদের প্রতি আহ্বান' শীর্ষক প্রস্তাবটিতে গোর্কী এবং বারবুসের সেই প্রশ্নটি নতুন ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে: 'সংস্কৃতির শিক্ষকেরা! আপনারা কোন্ পক্ষে?' সেখানে বলা হয়েছে যে, আজকার পরিস্থিতিতে প্রশ্নটি নিম্নোক্তরূপে নিয়ে দেখা দিয়েছে: 'আমরা, সাংস্কৃতিক কর্মীরা, আমাদের সমস্ত প্রভাব ও ক্ষমতা, জনগণের মন ও হৃদয়কে প্রভাবিত করার শক্তি নিয়ে আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধের বিরুদ্ধে, জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবো অথবা মানবতার শত্রুদের আক্রমণের সামনে অসহায় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকব? নয়া-ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে জনগণের সতর্কতাকে জাগ্রত করব, না অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে ফ্যাসিবাদকে মাথা তোলার সুযোগ দেব?'

প্রস্তাবের শেষে সমস্ত সৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যে, 'আসুন! আমরা মানুষের ভবিষ্যৎ এবং সংস্কৃতির জন্য, মানবতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হই। জনগণের সুখ ও শান্তি এবং মানবতার সপক্ষে, প্রতিক্রিয়া ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই সেই ব্যাপক ও সুদৃঢ় ঐক্যের প্রকৃত ভিত্তি।'

'আসুন! আমরা শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি এবং মানবতার হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফলে অর্জিত মূল্যগুলির সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই।'

সোভিয়েত সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ভূমিকার অপর দিকটি অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন কয়েকজন সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধি। বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল মানুষ নিজ নিজ দেশের সামগ্রিক জীবনে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। সেগুলি যখন প্রকাশিত হবে তখন মানবজীবনের অন্যান্য সমস্ত

ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্যের উপর অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েত সাহিত্যের উপর অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েত সাহিত্যের প্রভাবের সামগ্রিক চিত্রটি উজ্জ্বলরূপে দেখা দেবে।

সোভিয়েত সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্বন্ধে নানারকম মত থাকা সম্ভব, এমন কি যাঁরা তার সমর্থক তাঁদের মধ্যেও। কিন্তু একটি বিষয়ে কোন প্রগতিশীল মানুষের দ্বিমত থাকার কথা নয়। সোভিয়েত-সাহিত্য নিশ্চয়ই সমস্ত দেশেই সাহিত্যকে কয়েকজনমাত্র বিদগ্ধ মানুষের পাঠকক্ষের বাইরে টেনে এনে জীবনের সংঘাতসঙ্কুল প্রবাহের মধ্যে স্থান নিতে অনুপ্রাণিত করেছে, তাকে অবসর বিনোদনের উপায় হয়ে থাকার বদলে শ্রমজীবী-জনগণের সংগ্রামে সহ-যোদ্ধা হতে আহ্বান জানিয়েছে, সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রামে একটি শক্তিশালী অস্ত্রের ভূমিকা পূরণের জন্য প্রভাবিত করছে। এক কথায় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত এবং বিচারের নিরিখটাই বদলে দিয়েছে। সোভিয়েত-সাহিত্যের পঞ্চাশ বছরের হিসেবনিকেশ এবং তার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবিচার করতে হবে ঐ পরিপ্রেক্ষিতে ও নিরিখে।

॥ ৯ ॥

সোভিয়েত-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা : তত্ত্ব ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতার সমীক্ষা

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব হল সোভিয়েত-সাহিত্যের দিক-নির্দেশক ও নিয়ামক-নীতি। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে, অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পূর্তি বৎসরে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-লেখকসঙ্ঘের চতুর্থ-কংগ্রেসের প্রাক্কালে লেখকদের মধ্যে চিন্তা-বিনিময়ে এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে। ১৯১৯ সালের শরৎকালে মস্কোতে 'সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার সমস্যা' সম্বন্ধে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক ও সমালোচকদের প্রতিনিধি ছাড়াও পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া এবং পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে লেখক-কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থাপিত কয়েকটি রিপোর্টে, বিশেষত 'দি ক্রিয়েটিভ এক্সপিরিয়েন্স অফ ক্রিটিসিজম' বা 'সমালোচনার সৃজনধর্মী অভিজ্ঞতা'-নামক রিপোর্টটিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষ সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ এবং সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। যারা এই বিষয়ে একটা পরিষ্কার, সুসংবদ্ধ ধারণালাভে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে উক্ত আলোচনা যথেষ্ট সহায়ক হবে।*

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ও সংগঠিত আলোচনা, তথা চিন্তা-বিনিময়ের কাজটি, দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। কয়েক দশক আগে একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। তবে স্বভাবতই তা তখন প্রাথমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। তারপরে যখন যতটুকু আলোচনা হয়েছে সেটা হয়েছে বিচ্ছিন্ন এবং অনেকটা বিমূর্তভাবে।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বকে জন্মকাল থেকেই নানা আক্রমণ, অপব্যাখ্যা, সমালোচনা, বিতর্ক ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আজও তার বিরাম নেই। যারা সচেতনভাবে ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের ও তার জীবনদর্শনের সমর্থক তারা প্রথম থেকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের উপর বহুমুখী আক্রমণ চালিয়েছে, এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। যারা হয়ত সচেতন

ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল নয় অথচ যাদের চিন্তা 'শিল্পের জন্য শিল্প' 'শিল্পীর বিমূর্ত স্বাধীনতা' 'সাহিত্যসৃষ্টি নিছক সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অনুভূতি, রুচি ও অন্তরের প্রেরণা প্রসূত' ইত্যাদি ধারণার দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত তারাও এই তত্ত্বের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। সেই সঙ্গে অবশ্য স্বীকার করা দরকার যে, যারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমর্থক তাদের মধ্যেও রয়েছে অনেক মতভেদ, প্রশ্ন ও সংশয়। একদিকে যেমন দেখা যায়, এই তত্ত্বকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত উগ্র অসহিষ্ণুতা, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে তত্ত্বের মূলনীতিগুলিকে বর্জন বা জোলো করে তোলার প্রবণতা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমর্থক মহলে যে-সব মতভেদ ও প্রশ্ন রয়েছে সেগুলির কতখানি ধনতান্ত্রিক সমাজের সাহিত্যভাবনার প্রভাবের ফলে, আর কতখানি এই তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ তথা বিকৃতির প্রতিক্রিয়া, তার সঠিক পরিমাপ করা কঠিন। তবে তত্ত্বের সম্বন্ধে বিভ্রান্তিসৃষ্টির ব্যাপারে উভয় প্রবণতাই অর্থাৎ সংকীর্ণতা এবং উদারনৈতিক মনোভাব যে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এইসব কারণে আমার মনে হয় যে, উপরোক্ত সম্মেলনে বা সোভিয়েত লেখক-কংগ্রেসে উপস্থাপিত বক্তব্যের পর্যালোচনার কালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছুটা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উক্ত তত্ত্বটি সম্বন্ধে আলোচনাও সাধারণত করা হয়ে থাকে অনেকটা ইতিহাস-নিরপেক্ষ, বিমূর্ত ও যান্ত্রিকভাবে। যেন তা হঠাৎ কোন একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকে একেবারে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যারা এর প্রতিপক্ষ এবং যারা সমর্থক, উভয় মহল থেকেই আলোচনা করা হয়ে থাকে উপরোক্ত ধরণে। অন্তত আমাদের দেশে তাই দেখা যায়। অথচ অন্য সব কিছুর মত এই তত্ত্বেরও একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি তথা পটভূমি এবং ইতিহাস আছে। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ থেকে হয়েছে তত্ত্বের রূপায়ণ এবং প্রয়োগের অভিজ্ঞতার আগুনে নিত্য-নতুন সমস্যা সমাধানের প্রবাহের মধ্য দিয়ে হয়েছে তার অগ্রগতি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, সোভিয়েত সাহিত্যে অর্থাৎ যেখানে প্রথম ঐ তত্ত্বের মূলনীতিগুলি সচেতনভাবে রূপায়িত করা হয় সেখানে তা গড়ে উঠেছে দুটি উপাদানের সংমিশ্রণে। একটি হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারা এবং অপরটি বিপ্লবী সাহিত্য তথা সামগ্রিক অর্থে শিল্পের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। সেই সাহিত্যের পটভূমি হিসাবে রয়েছে পূর্বতন

যুগগুলির সাহিত্যের উত্তরাধিকার, তার ঐতিহ্যের মহান ও প্রগতিশীল দিক-গুলি। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত-সাহিত্যিক ও সামাজিক চিন্তার সমগ্র মৌল সূত্রগুলি গড়ে উঠেছে ও পরিণতি লাভ করেছে সংগ্রামের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায়, সন্ধান ও জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নন্দনতত্ত্ব, রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুর সৃজনমূলক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রবাহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। ঐ অগ্রগতি একটা সরলরেখায় অর্থাৎ ক্রমাগত জয়লাভ তথা সাফল্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়নি। সে পথে দেখা দিয়েছে বহু প্রশ্ন, বিতর্ক, ভুলত্রুটি, অসাফল্য ও বাধা-বিপত্তি। সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার দিকটির প্রতি সোভিয়েত-সাহিত্য-সমালোচকেরা এতদিন খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার সমীক্ষার সময় নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিকেরই উপর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রচেষ্টা চলেছে বস্তুনিষ্ঠ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার। আত্মসমীক্ষার পর তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, সামগ্রিক বিচারের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের মূলনীতিগুলির সঠিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সোভিয়েত-সাহিত্য তার ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরে কখনোই মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। সে লক্ষ্য হল নতুন সমাজগঠনের কর্মকাণ্ডে সাহিত্যের সক্রিয় অগ্রগামী ভূমিকা, জনগণের এবং কমিউনিষ্ট-পার্টির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় রেখে চলা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব তথা ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনের প্রতি নতুনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কনস্তান্তিন ফেদিন ১৯৬৩ সালে। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েত-সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ আত্মসমীক্ষার দিকে প্রথম পদক্ষেপ সুরু হয় তখন থেকেই। একদিকে যান্ত্রিক সংকীর্ণতা এবং অন্যদিকে উদারনৈতিক শৈথিল্য তথা উচ্ছৃংখলতা আমদানির প্রবণতার বিরুদ্ধে দ্বৈত সংগ্রামের সূচনা হয়।

স্তালিনী-ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম যুগে যে সোভিয়েত সাহিত্যের সংগ্রামী চরিত্রে কিছু পরিমাণে শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল সে কথা সোভিয়েত সমালোচকেরা স্বীকার করেন। ব্যক্তিপূজার আমলের কঠোর বিধিনিষেধ শিথিল করার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু লেখক পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রভাব সোভিয়েত-সাহিত্যে আমদানির চেষ্টা করেন। সেই ঝোঁককে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন থেকেই উপরোক্ত সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। সাহিত্যে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন এবং অবিচলভাবে চালিয়ে যাওয়া অথচ সাহিত্যিক ও শিল্পীকে সৃজনমূলক প্রকাশের ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া—এই দ্বৈত কর্তব্যের মধ্যে কি-ভাবে যথাযথ

সমন্বয় করা যায় সেজন্য সন্ধান শুরু হয়। সেই হিসাবে ১৯৬৩-৬৭ এই কয়েক বৎসরকে বলা যায় সোভিয়েত সাহিত্যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ।

পাশ্চাত্যের সমালোচকদের জবাব দিতে গিয়ে কনস্তান্তিন ফেদিন বলেন যে, সোভিয়েত-সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব ভুল ধারণা প্রচলিত আছে (যারা সচেতন-ভাবে অপপ্রচার করে তাদের কথা আলাদা) সেগুলির উৎপত্তি হয়েছে সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশে ঐতিহাসিক উপাদানটিকে উপেক্ষা করার ফলে। পশ্চিমী-সমালোচকেরা সমস্ত দেশের সাহিত্যকে বিচার করেন তাঁদের নিজেদের শিল্প-নীতির নিরিখে এবং যে জাতির সাহিত্য ও শিল্প পাশ্চাত্যে প্রচলিত ফ্যাশানের সঙ্গে খাপ খায় না তাকেই তাঁরা অপরিণত আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে-সব দেশ ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত বা সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের সাহিত্যে সেই অভিজ্ঞতা স্বকীয় চরিত্র ও রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। স্বভাবতই তা পাশ্চাত্যের সাহিত্য বা শিল্প-রীতির অনুকরণ করবে না। তেমনি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাহিত্যও তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রূপ পরিগ্রহ করছে।

ফেদিন ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপর খুব সঙ্গত ও সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাধারণত দেখা যায় যে, সমালোচকেরা একটি অত্যন্ত পরিচিত সত্যকে উপেক্ষা করে সোভিয়েত-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

সোভিয়েত-সাহিত্যের জন্মই হয়েছে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের বহ্নিশিখার মধ্যে। প্রতিবিপ্লব ও বিপ্লবের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামে কোন্ পক্ষ নেবে বা আদৌ কোন পক্ষ নেবে কি-না এসব প্রশ্ন নিয়ে ড্রইংরুমে বা গজদন্ত-মিনারে বসে বিতর্কের অবকাশ সে পায়নি। বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় সাহিত্যিকদের বেছে নিতে হয়েছে যে, তাঁরা ব্যারিকেডের কোন্ দিকে স্থান নেবেন। এই মূল প্রশ্নটির মীমাংসার পর তাঁদের (যাঁরা বিপ্লবের পক্ষ বেছে নিলেন) সামনে দেখা দিল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন শিল্পতত্ত্ব, সফল শিল্পরীতি ও রূপ-উদ্ভাবনের সমস্যা এবং কর্তব্য।

ঐসব বিপ্লবী সাহিত্যিকদের কর্মক্ষেত্রকে তখন অত্যন্ত সঠিক অর্থেই তৃতীয় রণাঙ্গণ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সামনে কঠিন কর্তব্য, গুরু-দায়িত্ব, নানা সমস্যা, বাধা ও বিপত্তি। নন্দনতত্ত্বগত সম্বলের মধ্যে ছিল শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন-নির্দেশিত সূত্রগুলি এবং প্রাক্-বিপ্লবকালের সংগ্রামী সাহিত্যিক বিশেষত ম্যাক্সিম গোর্কির কিছু কিছু রচনা। সেই সময়ের পরিস্থিতির জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় নবগঠিত সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের শিক্ষামন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা আনাতোলি লুনাচারস্কী কর্তৃক ১৯২৫ সালে লিখিত 'বিপ্লব ও সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধটিতে।

পুরাতন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বিপ্লবের পক্ষ ছেড়ে প্রতিবিপ্লবের শিবিরে যোগ দিয়েছে। যারা নতুন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কিছু পরিমাণে সহযোগিতা করছে তারাও অনেকটা উদাসীন। বিশেষত নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তারা পুরাতন মত অনুসরণ করে চলেছে। বিপ্লবের ডাকে যারা কালবিলম্ব না করে সাড়া দিয়েছিল তারা হল শিল্পী-সাহিত্যিকদের চরম বামপন্থী অংশ। এদের আন্তরিকতা ছিল, মনে ছিল প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ কিন্তু সেই সঙ্গে এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত, অতিসরলীকৃত এবং নৈরাজ্যবাদী ধারণা।

লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি শিল্প ও সাহিত্য বা এককথায় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সঠিক নীতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট প্রথম থেকেই অতীত সংস্কৃতির সমস্ত উত্তরাধিকারকে রক্ষার জন্য সুদৃঢ় নীতি অবলম্বন করেছিল। অতীতের সুমহান কৃতিগুলিকে অবহেলা করা যে কত ভুল সেকথা লেনিন পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে রক্ষা করেই শুধু শ্রমিকশ্রেণী সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কমিউনিষ্ট-পার্টি তাই বলেছিল যে, সমাজে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে সংস্কৃতি নতুনভাবে বিকাশ লাভ করবে। গড়ে তুলতে হবে নতুন প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সেই সঙ্গেই বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ঐ ধরণের বিকাশ সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র অতীতের সংস্কৃতির মূল্যায়ন এবং তার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির নিজ-করণের ভিত্তিতে।

কিন্তু অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মূল্যায়নও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, পার্টি ও গভর্ণমেণ্টের নির্দেশিত সঠিক নীতি-রূপায়ণের পথে বাধা আসে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদেরই মধ্য থেকে। লুনাচারস্কীর উপরোক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রথম বাধা আসে কয়েকটি তথাকথিত প্রলেতারিয় ঝোঁকের তরফ থেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব ঝোঁক শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার কিছু কিছু তথাকথিত অর্ধ-শিক্ষিত উপাদানের সমর্থনে পুষ্ট হয়েছিল। তারা অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করতে চায় এবং বিশ্বাস করে যে, বিশুদ্ধ প্রলেতারিয় সংস্কৃতি সৃষ্টি হবে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। দ্বিতীয় বাধা আসে অতীত সংস্কৃতির নীতিগুলির উপরে 'ফিউচারিস্ট' বা ভবিষ্যৎবাদীদের নেতিবাচক আক্রমণের ফলে। এদের বক্তব্য ছিল যে, তারা সমকালীন যুগের উপযোগী প্রকাশভঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং অতীতের সবকিছুকে ঝেঁটিয়ে বিস্মৃতির গহ্বরে বিদায় করা দরকার। তখনকার পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তব্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে যখন

জীবন-মরণ সংগ্রাম চলেছে তখন স্বভাবতই সাংস্কৃতিক রণাঙ্গণে প্রচার-সাহিত্যের উপরই বেশি জোর পড়ে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত বিভাগও এই স্তরে প্রচারমূলক শিল্প ও সাহিত্যের উপরই জোর দিতে বাধ্য হয়। তবে 'প্রচারমূলক' কথাটিকে উন্নাসিক দৃষ্টিতে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। বিপ্লবী শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা 'প্রচার'কে নতুন চরিত্রদান ও তার মাধ্যমে অনেক অবদান উপস্থিত করেন।

গৃহযুদ্ধে বিজয়লাভের পর সর্বপ্রধান কর্তব্য হয় দেশের বিধ্বস্ত অর্থ-নীতির পুনর্গঠন। এটি ছিল নতুন অর্থনৈতিক নীতির যুগ। লুনাচারস্কীর প্রবন্ধে জানা যায় যে, এই যুগে সাংস্কৃতিক খাতে সরকারী ব্যয় বহুল-পরিমাণে সংকোচ করতে হয় এবং তার ফলে শিল্পজীবনের প্রবাহও খানিকটা পরিমাণে সংকুচিত হয়। কিন্তু অন্যদিকে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এবং বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরাতন বুদ্ধিজীবীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নতুন সমাজব্যবস্থার সপক্ষে আসা শুরু করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'সহযাত্রীদের' একটা বড় দল বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেয়। এদের সকলের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক সমান ঘনিষ্ঠ ছিল না। এদের এক অংশ ছিল সত্যই বিপ্লবের সন্তান, আবার এমন অনেকে ছিল যারা ছিল আগে বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন এবং সম্প্রতি মত পরিবর্তনের পর সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের সাংস্কৃতিক নীতি সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে দেখা যায় কয়েকটি সুপরিচিত নাম। অন্যপক্ষে, যারা অবিচলভাবে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে এসেছে তাদের মধ্যেও সুপরিচিত নামের অভাব ছিল না।

এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রের কাজে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং শিল্প-সৃষ্টিতে গভীরতা দেখা দেয়। সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের নীতি আগের মতই দুটি পরিপূরক ধারাকে অনুসরণ করে চলতে থাকে। একদিকে অতীতের শিল্পকে রক্ষা এবং ক্রমে বেশি পরিমাণে বলিষ্ঠভাবে নতুন গঠনকর্মে নিয়োগ করা; অন্যদিকে নতুন ও সুস্পষ্টভাবে বিপ্লবী শিল্পকে উৎসাহদান। সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে অবশ্য একদিকে চিরায়ত সাহিত্য থেকে শিক্ষালাভের পক্ষপাতী এবং অন্যদিকে ফিউচারিস্ট—এই দুই ঝোঁকের মধ্যে পুরানো লড়াইয়ের জের তখনও চলছে। তেমনি সংঘাত চলেছে যারা 'বিশুদ্ধ প্রলেতারিয়' শিল্পের সমর্থক এবং যারা পাতিবুর্জোয়া ও আধা-পাতিবুর্জোয়া সহযাত্রীদের বিপ্লবের নতুন গঠনকর্মে টেনে আনার পক্ষপাতী—তাদের মধ্যে।

যাঁরা সোভিয়েত-সাহিত্যকে প্রথম থেকেই কঠোরভাবে পার্টি ও গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে প্রচার করেন বা সেই প্রচারে বিভ্রান্ত হন তাঁরা শুনে

আশ্চর্য হবেন যে, কমিউনিস্ট-পার্টি বা সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট কোন হুকুমনামা জারীর দ্বারা উপরোক্ত বিতর্কের মীমাংসা করতে চায়নি। লুনাচারস্কীর উক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রীয় সাহিত্য প্রশাসন বিভাগ Censorship সম্বন্ধে খুবই মোলায়েম নীতি অনুসরণ করেছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধু-মাত্র প্রতিবিপ্লবী-সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্যকে। যে-সব ক্ষেত্রে কোন Censor স্বাধীনভাবে শিল্পসৃষ্টির কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে সে-সব ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট ও পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থাগুলি হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা করেছে শিল্পকে যথা-সম্ভব স্বাধীনতাদানের নীতির অনুকূলেই।

যারা 'বিশুদ্ধ প্রলেতারিয়' শিল্পের সমর্থক ছিল তাদের সমালোচনার সময় একটা কথা মনে রাখা দরকার। নতুন সংস্কৃতি রচনার সেই প্রথমপর্বে তাদের মধ্যে অনভিজ্ঞতা, শিশুসুলভ বিচ্যুতি, উগ্র অসহিষ্ণুতা, যান্ত্রিক ধারণা ইত্যাদি বহুল পরিমাণে ছিল বটে কিন্তু তেমনি ছিল বিপ্লবের প্রতি অবিচল আনুগত্য। আর ছিল বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণের জীবন্ত অভিজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ সঙ্ঘচেতনা। সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে এগুলি হল অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। তাদের সেই অভিজ্ঞতা ও সঙ্ঘচেতনার সঙ্গে তত্ত্বগত শিক্ষার যথাযথ সংযোগের ফলে জন্ম নেয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব।

মোটের উপর, শৈল্পিক উৎকর্ষ, শিল্পরীতি, অতীতের উত্তরাধিকারের মূল্যায়ন—এক কথায় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও সংগঠিত আলোচনার জন্য অন্তত যে-টুকু সুস্থির পরিবেশ প্রয়োজন তা সৃষ্টি হয় এই সময়ে। ইতিমধ্যে শিল্পক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার সমীক্ষাও কাজের সহায়ক হয়।

মার্কস-লেনিনবাদী নন্দনতত্ত্বকে একটা সামগ্রিক কাঠামো হিসাবে রূপদানের প্রচেষ্টায় যাঁরা নেতৃত্বদান করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কী এবং আনাতোলি লুনাচারস্কী। লুনাচারস্কীই বোধ হয় প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার একটা বিস্তৃত সংজ্ঞা উপস্থিত করেন। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম এখানে দেওয়া গেল :

সাহিত্য প্রত্যেক যুগেই তা যে-শ্রেণীর অভিব্যক্তি সেই শ্রেণীকে সংগঠিত করার কর্তব্য সম্পাদন করে এসেছে। এমন কি, যে-সাহিত্য 'শিল্পের জন্য শিল্প'-তত্ত্বের নামে নিজেকে বাস্তব তথা সামাজিক সংঘাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে তার মধ্যেও সাহিত্যিকের জানিতে বা অজানিতে তাঁর নিজ-শ্রেণীর জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। তথাকথিত 'বিশুদ্ধ শিল্প' সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর তৎকালীন মানসিকতার অভিব্যক্তি।

সাহিত্যে বাস্তবতার তত্ত্বের বিবর্তনে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। যে-সব নতুন শ্রেণী সমাজকে পরিবর্তিত এবং প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য

প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট তারা স্বভাবতই বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট হয়। কেন-না, পারিপার্শ্বিক জগতে নিজেদের স্থান খুঁজে নেওয়া, নিজেদের সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি ও শত্রুভাবাপন্ন সামাজিক শক্তিগুলির বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধেও থাকা চাই পরিষ্কার ধারণা।

বুর্জোয়াশ্রেণী যখন তরুণ ছিল তখন সে ছিল শিল্পের সমস্ত রূপের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সমর্থক। সেই স্তরে বাস্তবতা ছিল প্রগতিশীল। তখন তা সামন্ত-অভিজাতশ্রেণীকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর গুণ ও জীবনদর্শনকে চিত্রিত করেছে উজ্জ্বল বর্ণে। ঐ শ্রেণী তখন নিজেকে সমাজের সমস্ত নিপীড়িত অংশের প্রতিনিধি বলে দাবী করত। তাই তার জীবনদর্শনকেও ঐসব অংশের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে।

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ যখন বুর্জোয়া সমাজের নিষ্ঠুর শোষণের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং সামাজিক-দ্বন্দ্ব নতুনভাবে মাথা তুলেছে সেই সময়ে একদল মহৎশিল্পীর দ্বারা রূপায়িত হয় 'সমালোচনাত্মক বাস্তবতা' ('ক্রিটিকাল রিয়ালিজম')। এইসব শিল্পীরা সমাজ-বাস্তবের সত্যনিষ্ঠ ও জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বের আসল কারণ বা তার ঐতিহাসিক পরিণতি সম্বন্ধে এঁদের ধারণা ও লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল না। এঁরা মনে করতেন যে, সমাজবাস্তবের সত্যনিষ্ঠ চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তাঁরা শৈল্পিক সত্যের সেবা করে চলেছেন।

তৃতীয় স্তরে দেখা দেয় পাতিবুর্জোয়াদের হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতা। পুঁজিবাদী শোষণের ফলে নিজেদের শ্রেণীর ভাঙন ও আসন্ন ধ্বংসের সম্ভাবনাটা এদের মনে সমাজবাস্তব ও প্রকৃতি উভয়-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীতেই নিরাশার কালো ছায়া বিস্তার করে—নিরাশা এবং তার সঙ্গে বাস্তবকে এড়িয়ে পলায়নের মনোভাব।

এখান থেকে অতি সহজেই যেখানে পেঁছানো যায় তা হল 'প্রকৃতিবাদ' (ন্যাচারালিজম)। প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য হল যে, তা বাস্তবকে যেমন দেখে হুবহু তেমনিভাবে বর্ণনা করে, সমাজের ব্যাধির ছবি আঁকে কিন্তু তার মূল সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না বা ব্যাধি-নিরাকরণের পথ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। এই ধরণের পদ্ধতিতে কখনও কখনও হয়ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা ঘৃণার অভিব্যক্তি হতে পারে তবে তা ঐ পর্যন্তই সীমিত থেকে যায়।

শোষণহীন সমাজগঠনের সংগ্রামে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সাহিত্যের হাতিয়ারকে ব্যবহার করার বিরাট ভূমিকা আছে। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে পূর্বতন

যুগগুলির মহৎশিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পরূপ থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে এবং 'সমালোচনাত্মক বাস্তবতা'র সাহিত্যে আছে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয়। বিশেষত পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চিত্রগুলি তার মোহ-মুক্তি ও নিজস্ব সামাজিক লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণালাভে সহায়ক হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল যে, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন নতুন শিল্পদৃষ্টি, নতুন ধরণের বাস্তবতা। সে বাস্তবতা শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জানা, বোঝা বা বর্ণনা করায় সীমিত নয়—তা সেই অবস্থাকে পরিবর্তনের, তাকে অতিক্রম করার পথের সন্ধান দেয়; সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। লুনাচারস্কীর নিজস্ব কথায় : সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল সক্রিয়, তা পৃথিবীকে শুধু বুঝতেই চায় না, নতুনভাবে গড়তেও চায়। তা পৃথিবীকে অধ্যয়ন করে নতুনভাবে গড়ার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তার আঁকা সমস্ত চিত্রগুলিই এক বিশেষ ধরণের মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তা প্রকৃতি ও সমাজের দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র অর্থাৎ বিরোধের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন। তাই তা ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য হল আদর্শনিষ্ঠ। কোন্ শক্তিগুলি সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কোন্‌গুলি এগিয়ে যেতে সাহায্য করে—এই দুইয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে তা খুব সচেতন। জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই তার সৃষ্ট শিল্পরূপগুলির উপর ভিতর ও বাহির দুদিক থেকেই আলোকসম্পাত করা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, এটা কি এক ধরণের 'রোমাণ্টিসিজম' নয়? উত্তরে লুনাচারস্কী বলেন যে, নিশ্চয়ই রোমাণ্টিসিজম, তবে বিশেষ ধরণের। তিনি বলেন যে, গোর্কী এই নতুন ধরণের বাস্তবতাকে বিপ্লবী, সংগ্রামী রোমাণ্টিসিজম বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ তার কাজ হল বাস্তবকে সংগ্রামী ও সক্রিয়ভাবে জয় করা। বাস্তবের নিছক ফটোগ্রাফারের ভূমিকা নিয়ে তা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কীর মতামত একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, রোমাণ্টিসিজমের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট পৃথক ধারা দেখা যায়। একটি হল নিষ্ক্রিয়—তা বাস্তবের উপর কৃত্রিম রংয়ের তুলি বুলিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায় অথবা বাস্তবকে এড়িয়ে অন্তরজগতে তথা কল্পলোকে পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। মোট কথা, তা মানুষকে সংগ্রামবিমুখ করে রাখে। অপর ধারাটি হল সক্রিয়, সংগ্রামশীল—তা মানুষের বাঁচবার ইচ্ছাকে তথা পরিবেশের উপরে বিজয়লাভের সংকল্পকে শক্তিশালী করে, যে-কোন ধরণের দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায়। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন যে,

বাস্তবতা ও সংগ্রামী-রোমান্টিকতা এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই। অনেক মহৎশিল্পীর রচনায় ঐ দুই উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়।

লুনাচারস্কী গোর্কির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে বলা যায়ঃ বাস্তবতা + উৎসাহ, বাস্তবতা + অনুপ্রেরণা। যখন তা বর্তমানের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের উপাদানগুলি আবিষ্কার করে তুলে ধরে, যে-ভবিষ্যৎ এখনও অজ্ঞাত তার চিত্র আঁকে, বা যে নতুন মানুষ এখনও বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি অথচ সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে—তার চরিত্রের সমস্ত মহৎ সম্ভাবনাগুলিকে জীবন্তভাবে শিল্পের মাধ্যমে উপস্থিত করে, তখন নিশ্চয়ই বিপ্লবী রোমান্টিসিজমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সে রোমান্টিসিজম অবশ্যই বুর্জোয়া রোমান্টিসিজমের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের জিনিস। বুর্জোয়া রোমান্টিসিজমের প্রথম যুগে তার মধ্যে অনেক মহৎ উপাদান ছিল। কিন্তু কখনও তার ইতিহাস-দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না। তা নিজ-শ্রেণীর কর্মসূচী ও ঐতিহাসিক ভূমিকাকে মোহের জালে ঢেকে রাখত। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নিজ ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার আমোঘ অস্ত্রে সুসজ্জিত। সুতরাং তার রোমান্টিসিজমকে বলা চলে ভবিষ্যত-সৃষ্টির খসড়া পরিকল্পনা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের সাধারণ সংজ্ঞা নির্ণয় করাটা ছিল সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যের একটি প্রধান বা প্রথম অঙ্গ। দ্বিতীয় অঙ্গ হল তত্ত্বের প্রয়োগের সমস্যাগুলিকে বোঝা এবং সমাধানের চেষ্টা। সমস্যাগুলিও সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। কেন-না সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সাহিত্য তথা শিল্প সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করে তা এযাবৎকাল প্রচলিত সাহিত্য ও শিল্পভাবনা থেকে একেবারে আলাদা। পূর্ববর্তী যুগগুলিতে বাস্তবতা ও সমালোচনাত্মক বাস্তবতার প্রবক্তা মহৎশিল্পী ও সাহিত্যিকেরাও এই ধারণা নিয়েই কাজ করেছেন যে, তাঁরা শিল্পসৃষ্টি করছেন শুধু নিজেদের অন্তরের তাগিদে। সেই তাগিদের পিছনে রয়েছে যে সামাজিক তথা শ্রেণী-পরিবেশ তা নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামান নি। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মধ্যে যাঁরা হয় ত সচেতনভাবে সাহিত্যকে সামাজিক প্রগতির সপক্ষে ব্যবহার করেছেন তাঁরাও এর সামাজিক চরিত্র, ভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি প্রশ্নের উপর মনোযোগ দেন নি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বকে পথনির্দেশক রূপে মেনে নিয়ে যাঁরা শিল্পসৃষ্টি করবেন তাঁদের সামনে যে-প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তার দুটি দিক আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি দিক দেখা দেয় পরস্পরবিরোধী রূপে। অর্থাৎ একদিকে সাহিত্যকে হতে হবে সমাজ-সচেতন, শ্রেণী-সচেতন এবং ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে তার ধারণা হবে সুস্পষ্ট—অন্যদিকে তাঁর সৃষ্টিকে

শিল্পের বিচারে সফল এবং রসোত্তীর্ণ হতে হবে। সাহিত্যিক ও শিল্পী হবেন সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথী, সংগ্রামীবাহিনীর একজন সৈনিক, সমষ্টির (collective) সভ্য। অথচ শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কাজ করে ব্যক্তি তথা ব্যক্তির মনন, অনুভূতি, হৃদয়াবেগ, সংবেদনশীলতা, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী ও রসজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে। কাজেই সেদিকটা উপেক্ষা করলে সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান আওড়ান চলে কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হয় না। তাই প্রশ্ন ওঠে শিল্পীর প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে কতখানি, বিষয়-নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপারে তিনি কতটুকু স্বাধীনতার অবকাশ পাবেন ?

উপরোক্ত বিরোধের সমাধান হতে পারে নতুন ধরণের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সমাজ-সচেতন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এবং নতুন সামাজিক পরিবেশে সমষ্টি ও ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বলাবাহুল্য যে, এই কাজটিও দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। শ্রমিকশ্রেণীর যেমন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর নিজেকে নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনের আলোকে যাঁদের সাহিত্যসাধনার পথ উদ্ভাসিত হবে তাঁদেরও নিজেদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের প্রথম কংগ্রেসে ম্যাকসিম গোর্কী উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করেন। তিনি নতুন সমাজ-গঠনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণীর বীর সন্তানদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে, সামূহিক শ্রমের পরিবেশেই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে পারে। লেখকদেরও কর্তব্য সামূহিক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদাররূপে নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে সেই শক্তির সৃজনশীলতার বৈচিত্র্যগুলিকে বিকশিত করে তোলা। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে খর্ব করার কোন প্রশ্নই আসে না। প্রয়োজন হল নতুন সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য অবাধ সুযোগ দেওয়া।

সোভিয়েত সমাজজীবনে ঐতিহাসিক কারণেই পার্টি ও জনগণের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ এবং পার্টি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। তবে ফরমান জারী করে বা সবাইকে যান্ত্রিকভাবে একই ছাঁচে ঢেলে সাজার মনোভাবের দ্বারা সেই নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা যায় না। লেনিন সৃজনশীল রচনায় ভাবের প্রাধান্য এবং শিল্পীকে প্রকাশের সুযোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই নীতি অনুসরণ করে গোর্কী বলেন যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পার্টি-নেতৃত্ব থেকে সমস্ত অর্বাচীন প্রভাবকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। পার্টি নেতৃত্ব দেবে নৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে। তার

সর্বপ্রধান কর্তব্য হবে লেখকদের মনে যৌথ-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা। ব্যক্তিগত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বৈচিত্র্য এবং সামূহিক দায়িত্ব এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হবে।

লেখকদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তাঁদের শুধু সমাজ-সচেতন হলেই চলবে না, ভালো লেখক হতে হবে। সেজন্য মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের উদ্ধৃতি আওড়নোই যথেষ্ট নয়। নিজের বৃত্তি সম্বন্ধে থাকা চাই প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং জীবনকে অধ্যয়ন করতে হবে গভীরভাবে।

লেখকদের মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্নও এই প্রথম যুগে উত্থাপিত হয়েছিল অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবের নেতিবাচক দিকগুলির সমালোচনা করা যায় কি-না এবং কতদূর পর্যন্ত করা যাবে। লুনাচারস্কী তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধটিতে এই বিষয়েও পথনির্দেশক সূত্র উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, নতুন সমাজগঠনের কর্মকাণ্ডে এখনও বহু কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। প্রত্যেক স্তরেই নানা ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি, এমন কি অন্যায় ও বিরক্তিকর খুঁটিনাটি ব্যাপার চোখে পড়বে। শিল্পী নিশ্চয়ই সেদিকে চোখ বুজে থাকবেন না। নেতিবাচক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে তাঁর কর্তব্য। তবে তিনি কি-ভাবে তা করবেন সেটাই হল প্রধান বিচার্য। তিনি যদি ঐ দিকগুলিকে সমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে সাময়িক প্রক্রিয়া বা দিক হিসাবে চিত্রিত করেন, সেগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব বলে মনে করেন ও সেজন্য পথের নির্দেশ দেন—সেটা হবে এক ধরণের জিনিস। এক্ষেত্রে শিল্পীর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী হবে ইতিবাচক এবং তা সমাজকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কিন্তু তিনি যদি নেতিবাচক দিকগুলিকে অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরেন, সেগুলিকেই সমাজজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থিত করেন তবে তার অর্থ হবে আমাদের সমগ্র সংগ্রাম ও কর্মসূচীর একেবারে মূলে আঘাত হানা। বলাইবাহুল্য যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিল্পীর স্বাধীনতার নামে এই ধরণের প্রচেষ্টা, যা প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করে, প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

লেখকসঙ্ঘের প্রথম কংগ্রেসের পর প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি। একেবারে হয়নি তা নয়। 'সোভিয়েট লিটারেচার' পত্রিকাটির পুরাতন সংখ্যাগুলির পৃষ্ঠা উলটালে দেখা যায় যে, এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে আজকার দিনের মন নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ঐসব প্রবন্ধের আলোচনায় অনেক অসম্পূর্ণতা, একপেশেমি, এমন কি বিমূর্ততা রয়ে গিয়েছে। প্রয়োগের অভিজ্ঞতার আলোকে তত্ত্বের যে আলোচনা প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজন তার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য অনেক সময় ব্যক্তিপূজার আমলের

কঠোরতাকেই একমাত্র বা প্রধানত দায়ী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই ধরণের সমালোচনাও অনেকখানি একপেশে হতে বাধ্য। আলোচ্য সময়কালের ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সে কথা বোঝা যায়।

লেখক-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন জার্মানীতে নাৎসীবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর থেকে নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে এবং আজ হোক বা কাল হোক সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রান্ত হতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তারপরের দুটি অধ্যায়ে যথাক্রমে দেশরক্ষার জন্য জীবনমরণের সংগ্রাম এবং যুদ্ধোত্তর যুগে বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও জীবনযাত্রাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কঠোর প্রয়াসে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে।

যুদ্ধোত্তরকালে আত্মসমীক্ষার যে উদ্যোগ নেওয়া যেত তা ব্যক্তিপূজার প্রভাবে ব্যাহত এবং কয়েক বৎসর বিলম্বিত হয়েছে এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই। সোভিয়েত কমিউনিস্ট-পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেও সেদিকে সুষ্ঠু পদক্ষেপ সহজ ছিল না। কেন-না উক্ত কংগ্রেসের পর পূর্বতন অনেক ধারণা ও মাপকাঠি পরিত্যক্ত হয়, অনুভূত হয় অনেক প্রশ্নকে নতুনভাবে বিচারের প্রয়োজন। এইদিকে সংহত প্রচেষ্টা সুরু হয় ১৯৬৩ সালে। সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সামগ্রিক আত্মসমীক্ষার যে প্রচেষ্টা হয় তা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের চতুর্থ কংগ্রেসের প্রাক্কালে যে-সব সমবেত আলোচনা সংগঠিত হয় তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমস্যা সম্বন্ধে সম্মেলনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার মূল আদর্শ ও কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত এবং প্রকাশভঙ্গীতে বৈচিত্র্য আনার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচিত প্রশ্নগুলির মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক আলেকজান্দার মিয়াসনিকভ 'সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজম অ্যান্ড কোয়েশ্চনস্ অফ থিয়োরী' নামক রিপোর্টে বিশ্ব-সাহিত্য এবং বিশেষভাবে বালজাক, স্তাঁদাল, গ্যেটে, শিলার ও রুশীয় বাস্তবতাবাদীদের সৃজনধর্মী অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার ভিত্তিতে সমকালীন সাহিত্যভাবনার একটি মূল প্রশ্ন অর্থাৎ শিল্পে জীবনের প্রতিফলন এবং নতুনভাবে সৃষ্টি (re-creation)-র সমস্যা উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন যে, নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তব হল একটি নতুন জগৎ। শিল্পী তাকে

সৃষ্টি করেন বিষয় ও বিষয়ী (object and subject) উভয়ের মিলনের ফলে। বাস্তব জগতের মত এই নন্দনতাত্ত্বিক জগতেরও তাৎপর্য বহুবিচিত্র। বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিকেরা শিল্পে বিষয় ও বিষয়ীগত উপাদানের সম্পর্কের সমস্যা সমাধানে বিষয়ী বা সাবজেকটিভ দিকটিকে প্রাধান্য দান করেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা সমস্যাটিকে বিচার করেন উভয়ের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। শিল্পের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি বাস্তব পরিবেশেরই প্রতিফলন, তার পরিবেশ-নিরপেক্ষ ও 'স্বাধীন' অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শিল্পী শুধুমাত্র জীবনকে অধ্যয়ন করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। শিল্পে বাস্তবকে নতুনভাবে সৃষ্টির জন্য কি-ভাবে বহুমুখী ও নানাধরণের 'মাল্টি-ডাইমেনশানাল' রূপ বা চিত্র উদ্ভাবন করতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। যথার্থ শিল্প জীবনের নকল নয়, তা জীবনকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে, জীবনের নিয়মগুলি অধ্যয়নের দ্বারা মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দিকগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। শিল্পসৃষ্টির পদ্ধতি একটি জটিল প্রক্রিয়া। তার সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় এবং অন্যান্য নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যার (যথা, বিষয় ও বিষয়ীগত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক, নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবের চরিত্র, সেখানে নন্দনতাত্ত্বিক এবং অ-নন্দনতাত্ত্বিক উপাদানের সহাবস্থান ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জীবনের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে শিল্পগত রূপের সম্পর্ক, শিল্পরূপসৃষ্টির প্রক্রিয়া ও প্রকাশ-ভঙ্গী, শিল্পীর সচেতন ভূমিকা ইত্যাদি) সমাধান সম্ভব শুধুমাত্র উপরোক্ত সাধারণ সূত্রটির ভিত্তিতে।

'প্রবলেমস্ অফ দি রাইটারস্ ফ্রম দি ক্রিয়েটিভ স্ট্যান্ডপয়েন্ট অ্যান্ড সাম ফিচারস্ অফ মডার্ণ লিটারেচার' নামে প্রবন্ধ পড়েন উক্রাইনের বিজ্ঞান আকাডেমীর সদস্য লিওনিদ নোভিচেঙ্কো। বিংশতি কংগ্রেসের পরবর্তীকালের সোভিয়েত সাহিত্যজীবনকে গভীরভাবে অধ্যয়নের যে চেষ্টা করছে সেটাই ছিল তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়। তিনি সমকালীন সাহিত্যের দুটি বিশিষ্ট প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমটি হল সমস্যা-সচেতনতা। লেখকের তথা শিল্পীর তীক্ষ্ণ নাগরিক ও মানবিক বোধ হতে উদ্ভূত স্বাধীন সন্ধান ও অধ্যয়ন থেকে ঐ সচেতনতার উৎপত্তি। তার প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্যের প্রধান চরিত্রগুলির সজীব মননশীলতায়। তারা সর্বদাই জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান খোঁজায় সচেষ্ট।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল চিত্রণের authenticity বা প্রামাণ্যতার জন্যে সৃজনশীল শিল্পীর বহুমুখী উদ্যম। সাহিত্য অতীত ও বর্তমানের বাস্তবের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশের দ্বারা জটিল সত্যকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই প্রয়াস জীবনের বাস্তব গতিধারার প্রতি শিল্পীর তীক্ষ্ম দায়িত্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

নোভিচেঙ্কো বলেন যে, একদিকে বাস্তবের সত্যনিষ্ঠ ও সংযত বিশ্লেষণ অন্যদিকে জীবনের কাব্যধর্মী জয়গান, নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরার বিরাট ক্ষমতা—এই উভয়ের সমাবেশই হল রুশিয়ার মহান বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের (পুশকিন, লেরমন্তভ, গোগোল, তুর্গেনেভ, তলস্তয়, চেকভ প্রভৃতির) মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিশ্লেষণ ও জীবনের কাব্যিক জয়গান এই উভয় প্রক্রিয়ার ঐক্যকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য নতুন গুণগতভাবে উন্নত স্তরে এগিয়ে নিয়েছে। সে সাহিত্য একাধারে সংগ্রাম ও সৃষ্টির সাহিত্য।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং অন্যান্য সৃজন-পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও সম্মেলনে আলোচিত হয়। এই বিষয়ে উপস্থাপিত হয় দুটি ভিন্ন, এমন কি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। 'সোসিয়ালিস্ট রিয়ালিজম অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম ইন দি লিটারেচার অফ দি পিপলস্ অফ দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' নামক প্রবন্ধে মিখাইল পারখোমেংক মত প্রকাশ করেন যে, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর বছরগুলির সোভিয়েত-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের অস্তিত্ব দেখা যায়। তিনি বলেন যে, এক ধরণের সমাজ থেকে অন্য ধরণের সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়া যেমন জটিল, ঠিক তেমনি জটিল এক ধরণের সাহিত্য-শিল্পদৃষ্টি থেকে অন্য ধরণের দৃষ্টিতে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি। জনসাধারণের নন্দনতাত্ত্বিক সচেতনতার ক্রমবিকাশের গতিবেগের উপর তা নির্ভরশীল।

গিয়র্গি লোমিজে 'দি রিলেশান বিটুইন সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজম অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম্' নামক প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ১৯১৭ সালের পরে যে-সব সাহিত্যিক বাস্তবের সমালোচনা করেছেন তাঁরা তা করেছেন সমাজতন্ত্রের আদর্শেরই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সুতরাং তাঁদের কৃতিকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যের মধ্যেই স্থান দিতে হবে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণা প্রাণহীন অনড় নয়, পরিবর্তনশীল। সুতরাং আজকার দিনের ধারণা ১৯২০-এর বছরগুলির সাহিত্য সম্বন্ধে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়।

'রোমান্টিসিজম ইন কনটেম্পোরারি লিটারেচার' নামক একটি প্রবন্ধে আলেকজান্দার ওভচারেঙ্কো সোভিয়েত-সাহিত্যে একটি শক্তিশালী রোমান্টিক প্রবণতার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে শুধু প্রথম যুগেই নয়, সমকালীন সোভিয়েত-সাহিত্যেও কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান লেখকের রচনায় রোমান্টিক ধারা বেশ বলিষ্ঠভাবে বর্তমান। ওভচারেঙ্কোর মতে রোমান্টিসিজমকে

শুধু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি অঙ্গ হিসাবেই নয়, একটি স্বাধীন নন্দনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ারূপে স্বীকার করা উচিত।

ওভচারেংকোর মতটি কেউ কেউ সমর্থন করলেও অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাঁর বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণা এত ব্যাপক যে, তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রকাশভঙ্গী থাকা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও সমাজতান্ত্রিক রোমান্টিসিজমকে দুটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে দেখার চেষ্টা আসলে '৩০-এর বছরগুলির অপরিণত সূত্রগুলিকে ফিরিয়ে আনে।

অধ্যাপক পসপেলভ অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিল্পের পদ্ধতি হল জীবনকে প্রতিফলিত করার একটি নীতি। তা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নয়। সেই হিসাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য ও সেই সাহিত্যের প্রধান পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা দুটিকে পৃথক করে দেখতে চান। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। যে-সব লেখক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তাঁদের পাশাপাশি এমন কিছু লেখক রয়েছেন যাঁরা শুধু সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেন; তাঁরা হলেন 'সোভিয়েত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার বিবরণ সংকলয়িতা' অথবা বড় জোর 'সমাজতান্ত্রিক সমাজে ক্রিটিক্যাল রিয়ালিষ্ট'। সোভিয়েত সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে এমন অনেক লেখকের দেখা পাওয়া যায় যাদের 'ক্রিটিক্যালি-আফার্মেটিভ রিয়ালিষ্ট' সংজ্ঞা দেওয়াই সঠিক। পসলভের মতে উপরোক্ত ধরণে লেখকদের স্তরবিভাগের প্রবর্তন করলে কাউকে আগে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার 'বাইরে রাখার' প্রয়োজন হবে না। তাঁরা তখন নিজেদের যথাযোগ্য স্থান লাভ করতে সমর্থ হবেন।

ইভগেনি তাগের 'শিল্পসৃষ্টির পদ্ধতি'র উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চান যে, প্রত্যেক শৈল্পিক পদ্ধতিরই নিজস্ব শৈল্পিক ভাষা আছে। শৈল্পিক পদ্ধতি হল জীবনকে শিল্পদৃষ্টিতে দেখা ও জানা। সুতরাং সেখানে দর্শন আমদানী করাটা ঠিক নয়। তাঁর মতে বাস্তবতার ভাষা হল বিষয়গত বর্ণনাত্মক ভাষা। রোমান্টিসিজমের ভাষা বিষয়কে কাব্যিক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে। আর আধুনিকতার ভাষা হল 'এক্স্প্রেশনিষ্ট' বা অভিব্যক্তিময়। বাস্তবতা হলেই তা যান্ত্রিকভাবে সত্যের প্রকাশ সুনিশ্চিত করে, আর 'আভাঁগার্দে' বা তথাকথিত অগ্রগামী সাহিত্য মাত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল—এইরূপ ধারণাকে তিনি কুসংস্কার বলে অভিহিত করেন। সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বৈচিত্র্যের উৎস কোথায় প্রশ্ন করে উত্তর হিসাবে তাগের বলেন যে, 'জীবনের জটিল দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পগত প্রবণতার মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে।'

অধ্যাপক পসপেলভ এবং ইভগেনি তাগেরের বক্তব্য সম্মেলনে তুমুল

বিতর্কের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ প্রতিনিধিই উপরোক্ত দুইজনের মতামতের কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁরা আসলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ধোঁয়াটে এবং লক্ষ্যহীন করে ফেলতে চান। অ্যাকাডেমি-শিয়ান মিখাইল খ্রাপচেঙ্কো বলেন যে, শিল্পসৃষ্টির পদ্ধতিটি সাহিত্যের বিকাশের প্রক্রিয়ারই একটি নিয়ম। তাকে নিছক প্রকাশের ভাষায় বা ভঙ্গীতে পর্যবসিত করা চলে না। চরিত্রসৃষ্টির সমস্যা, মানুষ ও পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইতিহাসের চালিকাশক্তিগুলি ইত্যাদি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শৈল্পিক-পদ্ধতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কখনই বাস্তবকে নিষ্ক্রিয়ভাবে অধ্যয়ন তথা ধ্যানের বস্তু অথবা প্রকৃতিবাদী ধরণে নিছক বর্ণনার বিষয় বলে মনে করতে পারে না। তার ভূমিকা সক্রিয় এবং সেই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েই তা জীবনকে ব্যাপক ও মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, শিল্পে নতুনভাবে ব্যাখ্যাও সৃষ্টি করে।

লেখক-সঙ্ঘের চতুর্থ কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের প্রতি অবিচল আনুগত্যের কথা পুনরায় ঘোষণা এবং মূল সূত্রগুলিকে আরো বিশদ ও যুগোপযোগীরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বিশেষত্বগুলি পরিস্ফুট হয়েছে তার অন্তর্নিহিত চরিত্রে। সেগুলি হল যথাক্রমে : জীবনের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎবোধ সম্বন্ধে শিল্পীর সচেতনতা (তিনি এই সচেতনতা অর্জন করেন বাস্তবের বৈপ্লবিক অগ্রগতির ধারা অধ্যয়নের মাধ্যমে), শিল্পের বলিষ্ঠ আশাবাদ এবং জনগণের ঐতিহাসিক কার্যকলাপের চিত্রণের উপর নিয়ামক গুরুত্ব আরোপ ; নতুন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত শ্রম সম্বন্ধে উৎসাহ এবং জনগণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও যৌথ কার্যকলাপের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিত্বের নতুন মর্যাদা ও আয়তনলাভ ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত দিকগুলি শৈল্পিক পদ্ধতির অগ্রগামী চরিত্রের অংশমাত্র। তত্ত্বগত সূত্রগুলির প্রাণবস্তু হল সমৃদ্ধ ও জীবন্ত সৃজনধর্মী প্রয়োগ।

সাহিত্য ও শিল্পসমালোচনা হল তত্ত্বের সফল প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য হাতিয়ার। উপরোক্ত 'ক্রিয়েটিভ এক্সপিরিয়েন্স অফ ক্রিটিসিজম' শীর্ষক রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েতে সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্য-বিজ্ঞান (Literary Science) পরিণতি লাভ করেছে সমাজতান্ত্রিক শিল্পতত্ত্ববিরোধী নানা মতবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বিরুদ্ধ মতবাদ অনেক সময় সমাজতান্ত্রিক শিল্পের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাতে প্রধানত দুটি ধারা দেখা যায়। একটির দৃষ্টিভঙ্গী হল যান্ত্রিক ও সংকীর্ণ এবং সেহেতু সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশে তা বাধা সৃষ্টি করেছে। এই ধারার প্রবক্তারা দাবী করে যে, শিল্পীর পক্ষে জীবনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও সত্যনিষ্ঠ-

ভাবে প্রতিফলিত করার বদলে পাঠকদের যথাসম্ভব সত্বর ও সহজ উপায়ে 'শিক্ষিত' করে তোলার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত। স্বভাবতই এর ফলে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় যান্ত্রিক চাপে বাঁধা, অতিসরলীকৃত 'শিক্ষা-মূলক' চিত্রণের উপর। তাতে শিল্পের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি হয়, শৈল্পিক মানও নীচু স্তরে আবদ্ধ থাকে। তবে সুখের বিষয় যে, এই ধরণের অতিসরলীকরণ ও যান্ত্রিকতার তিক্ত স্মৃতিকে সোভিয়েত-সাহিত্য বিগত দশকে মোটের উপর পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে।

অপর ধারাটি হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সূত্রগুলিকে সংশোধনের নামে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য এবং মতাদর্শ ও নন্দনতত্ত্বগত স্পষ্টতাকে বর্জনের প্রচেষ্টা। শেষোক্ত ধারাটির বিরুদ্ধে বিগত দশকে নতুনভাবে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

অতীতের যান্ত্রিক এবং অতিসরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বর্জনের ফলে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বাস্তবের (শিল্পগত ও ঐতিহাসিক) প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং সৌন্দর্যবোধ (পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলাটা সঠিক না হলেও) অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সাধারণ সুস্থ পুনরুজ্জীবনের পরিবেশে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা, বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ, অপরিণত সমালোচনা ও অভিযোগ, মানুষের কার্যকলাপের মূল্যায়নে সামাজিক কষ্টিপাথর ব্যবহারে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীনতা ইত্যাদির প্রকাশ হচ্ছে না তা নয়। বিশেষত তরুণ লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে প্রধানত তাঁদের অনভিজ্ঞতার দরুণ ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতীতের অতিসরলীকরণ এবং সামাজিক মাপকাঠির যান্ত্রিক প্রয়োগের ফলে তাকে খেলো করে ফেলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এদের মধ্যে সামাজিক মাপকাঠি তথা দৃষ্টিভঙ্গীকে এড়িয়ে চলার একটা মনোভাব দেখা যায়। এই সব ভ্রান্তি, বিচ্যুতি, অসুস্থ মনোভাব, এক কথায় নেতিবাচক দিকের প্রতি চোখ বুজে থাকার প্রশ্নই আসে না। সেগুলির বিরুদ্ধে সঠিক পদ্ধতিতে দৃঢ়চিত্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তবে ঐগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখারও প্রয়োজন নেই। কেন-না তা সোভিয়েত সাহিত্যের মূল চরিত্র ক্ষুণ্ণ করতে সমর্থ হয়নি। সমকালীন সোভিয়েত সাহিত্যের সামগ্রিক সাফল্যও তার প্রভাবে ম্লান হয়নি। উক্ত তরুণদের মধ্যে এখনও তত্ত্বগত জ্ঞানের দৃঢ়তা, অনুসন্ধানের পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। তারা শিল্পের রীতি ও শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যতটা সচেতন, তত্ত্বগত জ্ঞান ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে ততটা হতে পারেন নি।

উপরোক্ত উভয় ধরণের ভ্রান্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে রিপোর্টটিতে। বাস্তবকে সততার সঙ্গে অধ্যয়ন, জীবনের

অপ্রিয় এবং কঠিন সত্যকে স্বীকৃতিদান, সত্যকে সমগ্র ও পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি সফল শিল্পসৃষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তেমনি সেই কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের জন্য চাই বাস্তবের 'ঐতিহাসিক তাৎপর্য" অর্থাৎ ইতিহাসের গতিধারা সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা এবং মতাদর্শগত স্পষ্টতা, মানবতার ভবিষ্যৎ রচনায় সাম্যবাদের ভূমিকার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। শিল্পে জীবনসত্যকে স্বীকৃতিদান ও রূপায়ণের কাজটি শিল্পীর সামাজিক লক্ষ্য এবং সামাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। যারা এই দ্বন্দ্বমূলক ঐক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয় অথবা ঐ দ্বৈত-কর্তব্যকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তাদের কাজে এক ধরণের বা অপর ধরণের বিচ্যুতি হতে বাধ্য।

ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই যেমন নানা নতুন সমস্যা দেখা দেয় তেমনি সমস্যাগুলিকে বোঝা ও সমাধানের পদ্ধতিতেও নতুনত্ব দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং সন্ধান, বিতর্ক ও কিছু পরিমাণে বাধাবিপত্তি দেখা দিতে পারে। দেওয়াটা স্বাভাবিক এবং সেজন্য প্রশ্ন-উত্থাপন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ থাকা উচিত। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রশ্ন ও বিতর্কের নামে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি বা সে সম্বন্ধে সংশয়সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে রিপোর্টে 'নোভিমির' নামক পত্রিকাটির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

অতীতের যান্ত্রিকতা ও সংকীর্ণতার অবশেষগুলি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যে-সব তরুণ লেখক নানা নতুন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত রয়েছে অথবা অতীত সম্বন্ধে, এমন কি পদ্ধতিগত বিষয়ে, প্রশ্ন তুলছে বা সমালোচনা করছে, তাদের সবাইকে ঢালাওভাবে 'প্রকৃতিবাদী', 'পাতি-বুর্জোয়া ভাবধারার প্রবর্তক' ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করার ঝোঁক এখনও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

উভয়বিধ ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ইতিবাচক এবং সমালোচনাত্মক, উভয়দিকের দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যের সত্যটি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সত্যের আলোকে তরুণ, অনভিজ্ঞ লেখকদের সাহিত্যকৃতির ন্যায়নিষ্ঠ মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁদের ভুলত্রুটির সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের অবদান ও সম্ভাবনাগুলিকেও দেখতে হবে যথাযথভাবে বিচারবিবেচনা করে। তরুণ লেখক ও সমালোচকেরা যাতে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে, অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বগত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ়তা লাভ করতে পারে এবং নানা জটিল সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয় সেজন্য সাহায্য দিতে হবে। সাবজেক্টিভিজম, উৎকেন্দ্রিকতা, নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত ধারণা

ইত্যাদি কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের দিকে প্রসারিত করে দিতে হবে সাহায্যের হাত।

সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচনা যে বর্তমানে মূল লক্ষ্যে অবিচল থেকেও অনেক পরিমাণে সহিষ্ণু মনোভাব গ্রহণ করেছে সেকথা রিপোর্টটির পর্যালোচনা থেকে বেশ বোঝা যায়।

শিল্পীর লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং বাস্তবতার শিল্পরীতির সমৃদ্ধি-সাধনের উদ্দেশ্যে 'আনকনভেনশনাল' রূপ ব্যবহারের ও সুযোগদানের কথা বলা হয়েছে। যে-সব শিল্পী 'বিতর্কের বিষয়' অথচ যারা বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক আশাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান যুগের মূল সত্যকে প্রকাশের চেষ্টা করছে তাদের উপর বৈপ্লবিক বাস্তবের প্রভাবের বিষয়টিকে সত্যনিষ্ঠভাবে বিচার করে দেখার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

কর্তব্য কঠিন, সন্দেহ নেই। সে কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সাহিত্যসৃষ্টির প্রবাহের পাশাপাশি সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত চিন্তা, সমালোচনা ও বহুজাতিক সোভিয়েত-সাহিত্যের বহুমুখী অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান-সম্মত সমীক্ষার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। তাই সমালোচনা-বিভাগটিকে লেখক-কংগ্রেসে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসে আরো যে কয়েকটি রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে দুটির কথা অর্থাৎ 'কনটেম্পোরারিটি অ্যান্ড প্রবলেমস অফ প্রোজ রাইটিং' (সমকালীনতা এবং গদ্যরচনার সমস্যা) এবং 'কনটেম্পোরারি ডেভেলপমেন্ট অফ দি ট্র্যাডিশানস অফ সোভিয়েট ড্রামা' (সোভিয়েত নাটকের ঐতিহ্যের সমকালীন বিকাশ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত-সাহিত্যের অভিজ্ঞতার সমীক্ষার দিক থেকে এ দুটিও খুব মূল্যবান এবং শিক্ষণীয় বিষয়ে সমৃদ্ধ। স্থানাভাবে সে বিষয়ে আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমস্ত রিপোর্টগুলির মধ্যেই তত্ত্বগত দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংযত এবং প্রগাঢ় আত্মবিশ্লেষণের প্রচেষ্টার যে স্বাক্ষর সুস্পষ্ট তা সোভিয়েত-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথকে সুনিশ্চিত করেছে।

॥ ১০ ॥

পাভলভীয় মনোবিদ্যার কাছে নন্দনতত্ত্বের জিজ্ঞাসা

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব অধ্যয়ন করার সময় আমার মনে কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছিল। 'মানবমনে'র বিগত জুলাই সংখ্যায় বন্ধুবর ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'শিল্পী-মানসে সমকালীন বিরোধের প্রতিফলন' নামে প্রবন্ধটি পড়ে সেই প্রশ্নগুলি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তাই মনোবিদ্যা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁদের কাছে সেগুলি উপস্থিত করছি।

শিল্প কথাটিকে এখানে ব্যবহার করছি তার ব্যাপক অর্থেঃ সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, নাটক ও ছায়াচিত্র ইত্যাদি সমস্ত দিককে মিলিয়ে।

মার্কসবাদীরা শিল্পের সমাজতত্ত্ব অর্থাৎ তার সামাজিক চরিত্র এবং শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে তার ভূমিকা নিয়েই প্রধানত আলোচনা করেছেন এবং তা করেছেন খুব সঙ্গতভাবেই। আজ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মৃত্যুযন্ত্রণার চরম মুহূর্তে শিল্পকে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব জিনিস বলে প্রতিপন্ন করে তাকে জীবন-বিচ্ছিন্ন ও সংগ্রাম-বিমুখ করে তোলার জন্য এক সুসংহত অভিযান চলেছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার নামে চরম হতাশা ও পঙ্কিল গ্লানি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিবেশে শিল্পের সামাজিক চরিত্র এবং সংগ্রামী ভূমিকার কথা বলিষ্ঠভাবে পুনর্ঘোষণা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, অবক্ষয়ী শিল্পের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের জন্য শুধু তার নেতিবাচক সমালোচনাই যথেষ্ট নয়। শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপরে যথোচিত আলোক-সম্পাতের দ্বারা ইতিবাচক কর্তব্য নির্দেশের গুরুত্বও অপরিসীম।

কিন্তু মার্কসবাদীরা এ যাবৎ শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। হয়ত প্রথম যুগে এটা অনিবার্য ছিল। কেন-না অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে পুরাতন ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে। সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রামই তাঁদের কাছে মুখ্য হয়েছে। তবু বলতে হয় যে, অন্তত সমাজতান্ত্রিক সমাজের শিল্পীদের পক্ষে এই বিষয়ে আলোচনার যতখানি সুযোগ ছিল তা তাঁরা গ্রহণ করেন নি, বা যে দায়িত্ব ছিল তা যথাযথভাবে পালন করেন নি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট শিল্পেও শ্রেষ্ঠ, মাঝারি এবং নিকৃষ্ট তিন ধরণের জিনিস আছে। যা সেখানকার শ্রেষ্ঠ কৃতি তা বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি

লাভ করেছে। তথাপি, একটা কথা মনে না উঠে পারে না। যেখানে শিল্পীরা সমাজসচেতন, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত যাঁদের কাছে স্পষ্ট, সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ শিল্পের ফসল আরো অনেক-অনেক বেশি পরিমাণে আশা করা কি অসঙ্গত? সে আশা বহুল পরিমাণে সফল হয়েছে বলা চলে না।

কারণ হয়ত অনেক আছে। তার মধ্যে একটি কারণ কি এই নয় যে, শিল্প-সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা হয় নি? সোভিয়েত-সাহিত্যের প্রথম যুগে ম্যাকসিম গোর্কী ও লুনাচারস্কী আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন এ দিকটি উপেক্ষিত হয়ে ছিল। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েত-লেখকসংঘের চতুর্থ কংগ্রেসের প্রাক্কালে নতুন করে আলোচনা ও মত বিনিময় শুরু হয়েছে।

শিল্পসৃষ্টিতে মন, ভাব ও রসের প্রাধান্য। শিল্প সার্থক হতে গেলে সমাজ-সচেতনতা ও সংগ্রামী-প্রবণতাই যথেষ্ট নয়। তাকে রসোত্তীর্ণ হতে হবে। এই সত্যকে কোনমতে এড়িয়ে যাওয়া চলে না, বা রসের অভাবকে বুলি দিয়ে পূরণ করা যায় না। বরং সমাজ-সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব এ ব্যাপারে বেশি। রসসৃষ্টির সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিমানসের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিল্পের চরিত্র বা উৎস সামাজিক, প্রতিক্রিয়া সামাজিক, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র হল শিল্পী-মানস। সৃষ্টিটা হয় ব্যক্তিরই মাধ্যমে। এখানে তিনটি প্রশ্ন পরস্পরের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ ব্যক্তিমানসে সমাজবাস্তবের প্রতিফলন, ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিল্পী-মানসের বৈশিষ্ট্য। শিল্পীর মন নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। গভীর সংবেদনশীলতা, দৃষ্টির ব্যাপ্তি এবং সত্যনিষ্ঠা এই তিন গুণের সমাবেশ হয় যে-পরিমাণে সেই পরিমাণে শিল্পসৃষ্টি ধন্য হয় সার্থকতার আশীর্বাদে।

প্রথম দুটি সম্বন্ধে আলোচনার সুদৃঢ় ভিত্তি মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তারা রচনা করে গিয়েছেন। ব্যক্তিমানসে সমাজবাস্তবের প্রতিফলন দর্পণে প্রতি-বিম্বের মত নয়। সে প্রক্রিয়া সাধিত হয় সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ, চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাদির এবং বিশেষভাবে ব্যক্তির শ্রেণী-পরিবেশ, শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কার, আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে। এর সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রবণতা, রুচি প্রভৃতির প্রভাবের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। শিল্পীর মনে শ্রেণী-পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবের তত্ত্বটিকে যে জ্যামিতির ছকে ফেলা যায় না সে কথাও মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তারা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বালজাক রাজতন্ত্রের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শিল্পকৃতিতে

সামন্ততন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংস এবং সামন্তশ্রেণীর মানুষদের অধঃপতনের সত্য-চিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়েছে। তলস্তয় অভিজাত বংশের লোক তবু তাঁর উপন্যাসকে লেনিন রুশের তৎকালীন কৃষকসমাজের জীবন এবং মনের দর্পণ বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ অভিজাতবংশে এবং আধ্যাত্মিকতার পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যক্তি-মানসে সমাজবাস্তবের প্রতিফলন এবং ব্যক্তি ও সমাজমানসের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট আলোচনা এবং অধ্যয়ন হয় নি। এই বিষয় দুটি একান্তভাবে না হলেও, প্রধানত মনোবিদ্যার এক্তিয়ার ভুক্ত। তা নিয়ে অনধিকার চর্চা করার মত দুঃসাহস আমার নেই। তবে শিল্পী-মানসের প্রশ্নটি এই আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য বলে তুলতেই হচ্ছে।

মার্কসবাদীরা শেষোক্ত বিষয়টির প্রতি বোধ হয় আরো কম মনোযোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মন, ভাব, রস, হৃদয়াবেগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের অনেকের মধ্যে যেন বিমুখতা রয়েছে। অথচ ঐগুলির আলোচনা ছাড়া সার্থক শিল্প-আলোচনা হয় না, আর এগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন কারণও নেই। মার্কসীয় দর্শন ত মনের ভূমিকা অস্বীকার করে না। তা মন ও বাস্তবের যথার্থ সম্পর্ককে তুলে ধরে। মার্কসীয় বস্তুবাদ বলে যে, বস্তুর বিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি হল মানুষের মস্তিষ্ক এবং মননপ্রক্রিয়া। উদ্ভবের পর থেকে তা মানবজীবনে বিরাট সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। অসীম বৈচিত্র্যে-ভরা বিশ্বপ্রবাহ মানবমনের সামনে তার নিত্যনতুন দিক উদ্ঘাটিত করে জ্ঞান ও ভাবসম্পদের ভাণ্ডার ভরে দেয়। শিল্পীর মন সেইসব সম্পদ ও তার চিত্ররূপ (images) ইত্যাদির উপরে রস, রং ও কল্পনার তুলি বুলিয়ে নতুন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। তবে আর সেদিকটি নিয়ে আলোচনায় কুণ্ঠা কেন ?

মানুষের পা থাকে মাটিতে, মন ছোটে আকাশে, স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে। তার বাইরের জীবন বাস্তব সামাজিক পরিবেশ, উৎপাদিকা-শক্তির উন্নতির স্তর, সমাজ-সৌধ প্রভৃতির স্বারা সীমিত কিন্তু কল্পনা এগুলির গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। ভাববাদীরা কল্পলোককে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে চান। মার্কসবাদী কল্পলোকের সঙ্গে বাস্তবের প্রকৃত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। 'Disintegration of personality' নামক প্রবন্ধে গোর্কী এই প্রক্রিয়াকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কল্পনার জন্ম হয় প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু তা সমসাময়িক পরিবেশের সীমাকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তাই-না সমাজ এগিয়ে চলে, এক যুগের মানুষের স্বপ্ন সার্থক হয় উত্তরকালে।

গোর্কীর উপরোক্ত প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্য অন্য। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হওয়ার পর থেকে ব্যক্তি কি-ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং শিল্পে তার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লোক-কথার এক নতুন তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, সেখানে বীরকাহিনীগুলিতে যে-সব মহাশক্তিধর পুরুষের দেখা মেলে তাঁরা হলেন আদিম যুগের সমাজের সমষ্টিগত শক্তির প্রতীক। প্রমেথিউস, হারকিউলিস প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়েছে সমাজের যৌথশক্তির প্রতি বিশ্বাস। তাই তাঁরা লোকোত্তর শক্তির অধিকারী, দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপরাজেয়। পরবর্তীকালের সমাজে এই যৌথশক্তির প্রতি বিশ্বাস ও সংহতি-বোধ ক্রমশ দুর্বল হয়ে এসেছে বলে আর ঐ ধরণের চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না।

ম্যাকসিম গোর্কী শ্রেণীসমাজে ব্যক্তির ক্রমবিচ্ছিন্নতার প্রতি খুব সঙ্গত-ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'শিল্প একান্তভাবে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার', এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি দান্তে, শেক্সপীয়র, গ্যয়টে, শিলার, মিল্টন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এঁরা সকলেই লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহের দ্বারাই শিল্পসৃষ্টির উচ্চতম শিখরে পেঁছিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব এই প্রবন্ধের আলোচ্য সমস্যার সমস্ত দিকের উপর আলোকপাত করে না। প্রত্যেক সমাজেই বিচ্ছিন্নতা আপেক্ষিক। সমাজের প্রচলিত ভাবাদর্শ, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-মানসের যোগাযোগ রক্ষিত হয়। তাছাড়া নিজ শ্রেণী ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা চরমে ওঠে সমাজের অবক্ষয়ের যুগে এবং তার চরমতম রূপ দেখা যায় ধনতান্ত্রিক সমাজের মৃত্যুযন্ত্রণার কালে। তার কারণ ঐ সমাজ পূর্বতন যুগের সমস্ত সম্বন্ধ ও নৈতিক মূল্যবোধকে ভেঙ্গে চুরমার করে কেবল টাকার সম্বন্ধকেই একচ্ছত্র আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অবক্ষয়ের যুগেও যে-সব শিল্পী সচেতনভাবে নতুন যুগের উদীয়মান শক্তির পক্ষে যোগ দেন তাঁরা বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হন কম বা বেশি পরিমাণে। তবু দেখা যায় যে, তত্ত্বগতভাবে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠলেও, এমন কি কমবেশি পরিমাণে শ্রমজীবী-মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হলেও, সার্থক শিল্পসৃষ্টির সমস্যার সহজে সমাধান হয় না। ঐ একাত্মতা সমাজ-সচেতন শিল্পসৃষ্টির পূর্বশর্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তার সঙ্গে আরো কিছুর প্রয়োজন আছে যার অভাবে এই ধরণের শিল্পীদের অনেকের

রচনায় শিল্প-রসের সৌন্দর্য অপেক্ষা শ্লোগান-সর্বস্বতা ও প্রচারধর্মিতা প্রকট হয়ে ওঠে।

শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে সত্যকার এবং নিবিড় পরিচয় এই ধরণের শিল্পসৃষ্টির সাফল্যের অপর একটি পূর্বশর্ত। তবু ঐটুকু যে যথেষ্ট নয় তা সহজেই বোঝা যায়। নতুবা ত প্রত্যেক ট্রেডইউনিয়ন বা কৃষিকর্মীই গণজীবন নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারতেন। সেইজন্যই শিল্পী-মানসের বৈশিষ্ট্য ও সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে বিশেষ ধরণের সম্পর্কের প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বমূলক-চরিত্রের উপর মনোযোগ দেওয়া এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। ব্যক্তির বিকাশ তার সামাজিক পটভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু ঐ কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য আছে। এটুকু যদি না থাকে তবে ব্যক্তির কার্যকলাপে, মননে বৈচিত্র্য দেখা দিত না। শিল্পী, চিন্তানায়ক প্রভৃতি ধরণের ব্যক্তির বেলায় এই স্বাতন্ত্র্য আরো বেশি পরিস্ফুট। প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায় যে, যাঁরা নবযুগ-চেতনার পথিকৃৎ বা মহৎশিল্পী তাঁরা আশেপাশের মানুষের চিন্তা-সংস্কার-চেতনার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছেন বলেই নতুন ঊষার উদয়-সংকেত তাঁদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে এঁদের সংঘাত বাঁধে। যাঁরা অসাধারণ নন তাঁদের পক্ষেও কিছু পরিমাণে পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়োজন হয়। প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেই সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, অনেকটা প্রাকৃতিক ঘটনার ধরণে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উক্ত সমস্যার সমাধানে সচেতন ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে অগ্রসর হবে বলে আশা করা স্বাভাবিক।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ত ব্যক্তিত্বের বিনাশ চায় না। সেখানে সমাজের উদ্দেশ্য যৌথজীবনের কাঠামোর মধ্যে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রেখে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। শিল্পীর ক্ষেত্রে এই নীতি আরো বিশদভাবে প্রযোজ্য। সোভিয়েত-লেখকসঙ্ঘের প্রথম-কংগ্রেসে সোভিয়েত-সরকারের মুখপাত্রেরা সে নীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন।

শিল্পীর স্বাধীনতা সব সমাজেই আপেক্ষিক। শ্রেণী-সমাজে তা শাসক-শ্রেণীর স্বার্থের কাঠামোর দ্বারা-সীমিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ঐ স্বাধীনতা আপেক্ষিক, তবে তার সীমা অনেক প্রসারিত হবে বলে উদাত্ত ঘোষণা শোনা গিয়েছিল। রাষ্ট্রের বা পার্টির ফরমাইসে কিংবা প্রশাসনিক নির্দেশের দ্বারা যে সত্যকার শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, সেকথা সেদিন সোভিয়েত-রাষ্ট্রের নায়কেরা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ব্যক্তিপূজার যুগে উক্ত

প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি, লঙ্ঘিত হয়েছে। ফলে তৎকালীন শিল্পসৃষ্টিতে এক ধরণের যান্ত্রিকতা, একপেশেমি ও একঘেয়েমি এবং আড়ষ্টতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম দিকে আত্মপ্রকাশ করে এর বিপরীত এক প্রক্রিয়া। তখন শিল্পীর স্বাধীনতার নামে এক ধরণের নেতিবাচক, বুর্জোয়া-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-ঘেঁষা মনোভাব দেখা দেয়। তা মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের মূল ভিত্তিকে অস্বীকারের চেষ্টা করে। বাস্তবের যথার্থ রূপায়ণের নামে সোভিয়েত সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরে। এহেন পরিবেশেই পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ী সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান সোভিয়েত-সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে।

উপরোক্ত দুটি অবস্থাই অস্বাভাবিক। শিল্পী ও সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়েছিল এবং শিল্পসৃষ্টির সমস্যাগুলি নিয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা উপেক্ষিত হয়েছিল বলেই অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব। সুখের বিষয় যে, বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্বাভাবিকীকরণ ও উন্নতিবিধানের চেষ্টা চলেছে তেমনি সেই পটভূমিতে সোভিয়েত লেখক এবং শিল্পীরা দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

ঐসব প্রশ্নের আলোচনা আমাদের দেশেও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আছে। এমন কি সে সম্বন্ধে একটা বিরূপ মনোভাবও দেখা যায়।

প্রথমে ধরা যাক শিল্পীর অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা। বাস্তব ঘটনাবলী তাঁর মনে যে সাড়া জাগায় অর্থাৎ তিনি যতখানি গভীরভাবে তার তাৎপর্য অনুভব করেন তার উপরে নির্ভর করে রসসৃষ্টি বা সৃষ্টির স্বকীয়তা। সোভিয়েত-লেখকসঙ্ঘের প্রাক্-কংগ্রেস-আলোচনায় একজন বলেছেন যে, শিল্পী, বিশেষ করে কবিকে, উপলব্ধি করতে হবে যে, তিনি এক বিরাট যৌথসত্তার জীবন্ত অঙ্গ। এখন ঐ সত্যটি যদি কারুর কাছে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব মাত্র হয়ে থাকে তবে তাঁর রচনায় প্রাণরসের প্রাচুর্য দেখা দেবে না, বেজে উঠবে না আন্তরিকতার সুর। আর যদি সেই জিনিসটি তাঁর সমস্ত অনুভূতিকে প্লাবিত করে, যদি সমস্ত হৃদয় জুড়ে উপলব্ধি করেন যে, তিনি ইতিহাসের এক মহান সৃষ্টিযজ্ঞের অংশীদার—তবে রসের যে-দাক্ষিণ্য দেখা দেবে তা তৎসাময়িকতার গন্ডীকে অতিক্রম করে ভাবীকালের পাঠকদের মনেও সাড়া জাগাতে সমর্থ হবে। কবির বেলায় যে-কথা সত্য, শিল্পের অন্য ক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। এই দিকটি আমাদের দেশের মার্কসবাদী শিল্পীরা সাধারণত উপেক্ষা করে থাকেন বলেই একটা ধারণা প্রচলিত হয়ে গেছে যে, সমাজ-সচেতন সাহিত্য মানেই বুঝি নীরস কাঠখোট্টা কোনো জিনিস। কেউ কেউ আবার অনুভূতি, উপলব্ধি ইত্যাদি কথা শুনলেই তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার গন্ধ পান। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে

অ-গভীর পরিচয়ের ফলেই তা হয়। অনুভূতি, উপলব্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট।

উপরোক্ত আলোচনাচক্রে একজন সোভিয়েত লেখিকা সঠিকভাবেই বলেছেন যে, সাহিত্যের কাজ হল মনকে নাড়া দেওয়া, উদ্দীপিত এবং অনুপ্রাণিত করা। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে, তার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে সাহিত্যকেও এগিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি অবিচল বিশ্বাসের সঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পারমাণবিক ও মহাকাশচারণের যুগে সাহিত্যের ভূমিকা ত নিঃশেষিত হয়ইনি বরং তার দিগন্ত আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। আমারও ধারণা যে, এই যুগে শুধু বুদ্ধিরই নয়, মন তথা অনুভূতির ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে। আদিম যুগের মানুষ রূপকথার মাধ্যমে স্বপ্ন দেখত গ্রহান্তরে যাত্রার, কল্পনা করত বিশ্বধ্বংসী ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রকৃতির উপরে বিজয়লাভের। আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের জয়যাত্রা সেইসব স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলছে। এই ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে যদি কোনো শিল্পী আগামী কালের মানুষের বিজয় অভিযানের স্বপ্ন দেখেন তাতে দোষের কি আছে?

এই প্রসঙ্গে আবার কল্পনার কথা এসে পড়ে। গোর্কী বলেছিলেন যে, মানুষ তার জীবন-সংগ্রামে দুটি শক্তিশালী অস্ত্রকে বিকশিত করেছে। তার একটি হল জ্ঞান, অপরটি কল্পনা। কল্পনার অর্থ মূর্তির বা চিত্ররূপের (image) সাহায্যে চিন্তা করা। ভাববাদীরা কল্পনার বাস্তবভিত্তি স্বীকার করেন না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা বলেন যে, কল্পনা মূলত বস্তুভিত্তিক এবং তা হল বাস্তব সম্পর্কে চিন্তা করার একটি বিশেষ ধরণ। কল্পনা নিজেকে অব্যবহিত বাস্তবের এবং যা আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান তার গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখে না। এইখানেই তার বিশেষত্ব।

কল্পনাকে উপরোক্ত অর্থে গ্রহণ করলেই শিল্পে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। লুনাচারস্কী বলেছিলেন যে, শিল্পী যদি শুধু পার্টির কর্মসূচীর বিষয়বস্তুকেই একটু সাজিয়েগুছিয়ে অন্যভাবে প্রকাশ করেন তবে তার বিশেষ সার্থকতা নেই। যখন শিল্পী অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কুমারী-ভূমিতে হল চালনা করেন, লজিক ও পরিসংখ্যানে যা ধরা পড়ে না তাকে ফুটিয়ে তোলেন তখনই তাঁর ভূমিকা সার্থক হয়। এজন্য হয়ত অনেক দুঃসাহসী উপপাদ্যের (hypothesis) প্রয়োজন হবে, ভুলভ্রান্তিও হবে কিন্তু ভুলকে সংশোধন করা যাবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সাহায্যে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কাজ শুধু বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়। বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের যে সূচনা আত্মপ্রকাশ করে পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তার রূপায়ণই হল ঐ বাস্তবতার

মুখ্য ভূমিকা। শিল্পীকে তাই স্বপ্ন দেখতে হয় বৈকি। গোর্কী এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী রোমান্টিসিজম কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। 'মা' উপন্যাসে দেখি তার অনবদ্য রূপ। সেখানে শ্রমিক-আন্দোলনের যে-চিত্র রয়েছে তা একেবারে প্রথম দিকের। তবু ওর মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের আশ্বাস। তাই 'মা'র মৃত্যু আমাদের মনে হতাশা আনে না, জাগায় সংগ্রামের দুর্জয় সংকল্প।

সাম্প্রতিক সোভিয়েত-সাহিত্যে বীরচরিত্রচিত্রণ উপেক্ষিত হয়েছে। সোভিয়েত লেখকরা নিজেরাই প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলেছেন যে, কিছুদিন হয় সেখানে 'ডি-হিরোআইজেশনে'র তত্ত্ব প্রচলিত হয়েছিল। ঐ তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি হিসাবে বলা হত যে, বাস্তব জীবনের স্রোত পরিচালিত হয় অখ্যাত অজ্ঞাত গড়পড়তা এবং রোমান্টিকতা বর্জিত সাধারণ মানুষদের কাজের ফলে। সুতরাং তাদেরই প্রাধান্য দিতে হবে।

রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখকদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সভাপতির রিপোর্টে ঐ তত্ত্বকে নাকচ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বীরের চরিত্রে সমগ্র জনগণের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলি ঘনীভূতভাবে প্রকাশ পায়। তাই সাহিত্যের 'বীর' হলেন সমগ্র জনগণের প্রতীক।

বাস্তবতাকে নেহাৎ যান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখার ফলেই 'বীর' চরিত্রের উক্ত তাৎপর্যটি উপেক্ষিত হয়। হাওয়ার্ড ফাস্ট 'ফ্রীডম রোড' উপন্যাসে নিগ্রো মুক্তি সংগ্রামের নায়ক-চরিত্র সম্বন্ধে একই কথা বলেছিলেন অর্থাৎ তিনি উক্ত সংগ্রামের অনেকগুলি অগ্রণী সৈনিকের চরিত্র থেকে উপাদান নিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সৃষ্টি করেন।

'বীর'-চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা এসে পড়ে। যদি সত্যকার জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় তাহলে তার বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। পরিবেশের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে, সংগ্রামের আগুনে পুড়ে, নিজের অভ্যাস-কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা ইত্যাদি অনেক পিছটানের বিরুদ্ধে লড়াই করে, এক কথায় অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বীরচরিত্র আপন মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। বীরেরা ত হঠাৎ পূর্ণ পরিণত ভাবে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসে না। সুতরাং যদি ঐ প্রক্রিয়া-চিত্রণের বদলে যান্ত্রিক ছকে বাঁধা কোন ফরমায়েসী বীরকে আমদানী করা হয় তবে তা রক্ত-মাংসের জীবন্ত চরিত্র হয় না বরং শ্লোগানের সচল প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়।

বীর-চরিত্র রূপায়ণে মনোজগতের চিত্রণ (অবশ্যই বাস্তবের পটভূমিতে) অপরিহার্য। সোভিয়েত সাহিত্যে সাধারণত বীর-চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ দেখা যায় বিপ্লবে, গৃহযুদ্ধ এবং দেশরক্ষার যুদ্ধ-সংক্রান্ত সাহিত্যে। তখন মানুষের হৃদয়াবেগ, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, উদ্দীপনা সবকিছু বাঁধা

থাকে খুব চড়া সুরে। সেইজন্য তার রসপ্রবাহ স্বতোৎসারিতভাবে সাহিত্যে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু শান্তির সময়ে, সমাজতান্ত্রিক গঠনের কর্মকাণ্ডকে বিষয়বস্তু করে যে-সব সাহিত্য রচিত হয়েছে সেগুলির বেশির ভাগই কেমন যেন প্রাণহীন, ছকে বাঁধা, নিষ্প্রভ মনে হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন শোলোকভের 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্' উপন্যাসে কয়েকটি সুন্দর চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষদেরও অন্তর্দ্বন্দ্বের বহু উপাদান রয়েছে, যথা পুরাতন ভাবধারা ও অভ্যাসের সঙ্গে নতুন ভাবধারার সংঘাত, সমাজের অগ্রগতির প্রত্যেক অধ্যায়ে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। ব্যক্তি-মানসের সঙ্গে সমাজ-মানসের দ্বন্দ্বও নিশ্চয়ই রয়েছে। কেউ হয় ত সামাজিক চেতনার সমসাময়িক স্তরের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে আবার কেউ হয় ত এগিয়ে চলতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে। এইসব দ্বন্দ্ব, জিজ্ঞাসা, ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পের উপজীব্য হবে না কেন ?

শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া নিয়ে অ-মার্কসবাদী-মহল অনেক আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁরা ঐ প্রক্রিয়ার উৎসকে রেখেছেন রহস্যাবৃত করে। মার্কসবাদীদের সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে, তাই পাভলভীয়-মনোবিদ্ বন্ধুদের সামনে প্রশ্নগুলি রাখছি।

॥ ১১ ॥

রোমাঁ রোলাঁর জীবনজিজ্ঞাসা

কিছুদিন আগে মনীষী রোমাঁ রোলাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিম বাংলায় অনেকগুলি সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। রোলাঁর জীবন ও কৃতির নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আলোচনা হয়েছে খণ্ডিত রোলাঁকে নিয়ে। তাঁর গোটা জীবনকে একটা পরিণতির প্রবাহ হিসাবে দেখে সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা বিশেষ হয় নি। খণ্ডিত ভাবে দেখার চেষ্টাও আত্মপ্রকাশ করেছে প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র বা পরস্পরবিরোধী ধারায়, আর তা শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত দুইটি ভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল আমাদের দেশের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, বিদগ্ধ মহলের অভিজাত অংশকে নিয়ে। এঁরা রোলাঁকে দেখতে চেয়েছেন এক উদার, বিমূর্ত মানবতাবাদ ও বিশ্বপ্রেমের পূজারী এবং অন্তর-জীবন তথা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী রূপে। ভারতের সঙ্গে রোলাঁর সম্পর্ককে এঁরা দেখেছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর ব্যাখ্যাতা এবং রবীন্দ্র-নাথের বন্ধু হিসাবে। অপর সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল মার্কসবাদীদের এক অংশকে নিয়ে, তাঁদেরই উদ্যোগে। এঁরা বড় করে তুলে ধরেছেন রোলাঁর উত্তর-জীবনকে অর্থাৎ জীবনের যে-অংশে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমজীবী মানুষের সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আত্মপ্রকাশ করেছেন পুঁজি-বাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও সমস্ত দেশের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের সপক্ষে অক্লান্ত সৈনিক হিসাবে। অভিজাত বুদ্ধিজীবীরা রোলাঁর এই উত্তরজীবন তথা সংগ্রামী দিকটিকে একেবারেই উপেক্ষা করেছেন। অথচ এই দিকটিকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু শেষোক্তেরা আবার রোলাঁর প্রথম জীবনকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর আত্মসমালোচনার উল্লেখ করে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, রোলাঁ নিজেও নাকি তাঁর আগের অধ্যায়গুলির চিন্তা, ধ্যান-ধারণার সবকিছুকে ভুল বলে স্বীকার করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এরূপ অভিমতও একটা ছকে বাঁধা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত। দ্বিতীয়ত, এঁরা রোলাঁর উত্তর-জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককেও এড়িয়ে গিয়েছেন।

উপরোক্ত দুটি খণ্ডিত দৃষ্টির প্রতিফলন হয়েছে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য গঠিত দুটি কমিটির মধ্যে। যাঁদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা যে বামপন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সযত্নে বাদ দিয়ে চলবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু শেষোক্তেরাও রোলাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনকে একটা সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত করে রেখেছিলেন ; তাঁর সংগ্রামী-জীবনের প্রতি আস্থাশীল সকল প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে এক মঞ্চে উপস্থিত করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি।

উপরোক্ত দুইটি সংগঠিত প্রচেষ্টার বাইরেও অনেকে সভা-সমিতি কিংবা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সকলের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচয় বা পর্যালোচনা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে যদি নিজের অজ্ঞাতে কারুর উপর অবিচার করে থাকি সেজন্য আগেই মার্জনা ভিক্ষা করে নিচ্ছি।

মূল প্রশ্ন হল রোলাঁকে সমগ্রভাবে বোঝা নিয়ে। কারুর জীবনকেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন দুটি পাঁচিলঘেরা কামরায় ভাগ করা চলে না, বিশেষত রোলাঁর মত গভীর সংবেদনশীল সংগ্রামী ব্যক্তিত্বকে। খণ্ডিত দৃষ্টি, তা দক্ষিণ বা বাম যে দিকেরই হোক না কেন, তাঁর জীবন, কৃতি ও উত্তরাধিকারের যথার্থ মূল্যায়নে সাহায্য করে না। প্রথম থেকেই রোলাঁর জীবনের যাত্রা এগিয়ে চলেছে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সংগ্রাম শুধু বাইরের জগত, ধনতান্ত্রিক সমাজের অবিচার, রক্ষণশীলতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই নয়—তা চলেছে তাঁর অন্তর্জগতে, পুরাতন ধ্যানধারণা, সংস্কার, পিছুটান, নিজের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ঝোঁকের বিরুদ্ধে। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি এগিয়ে এসেছেন ভাবীকালের দিকে। সেই আগুনে পুড়ে তাঁর সত্যের সন্ধান, জীবনজিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ খুব তীক্ষ্ন, প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিপদে তিনি নিজের কাছে জবাবদিহি চেয়েছেন ও করেছেন। বাইরের জীবনের সংঘাত অন্তরজগতে যে ঝড় তুলেছে তার স্বরূপকে দেখতে চেয়েছেন যাচাই করে। ভিতর ও বাইরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন এক পরিপূর্ণ ঐকতান রূপে। সেই সাধনা, অন্তরজীবনের দ্বন্দ্ব-আকুলি, পথ হাতড়ে অগ্রসর হওয়া এবং ক্রমে সত্যজীবন-বোধের আলোকে দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত হওয়ার কাহিনী কালজয়ী শিল্পরূপ লাভ করেছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। এই দ্বন্দ্বের, সন্ধান ও সংঘাতের ইতিহাসকে যদি না দেখি তবে শিল্পী রোলাঁ, মনীষী ও সত্যের সৈনিক রোলাঁকে বোঝা অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীনই শুধু নয়, প্রাণহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তিনি যখন সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন ত সেই অতীতের সব

কিছুকেই বর্জন করে আসেন নি। শ্রেষ্ঠ রত্নগুলিকে পাথেয় হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, উত্তরকালে তাঁর জীবনবোধ যে রূপ নিয়েছে তার বীজ নিহিত ছিল ঐ অতীতে। বীজের মহীরুহে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বুঝতে গেলে সেই অতীতকে বিশ্লেষণ করে দেখা চাই। অন্যদিকে উত্তর-জীবনেও ত তাঁর নিজের সাথে দ্বন্দ্ব, জীবনজিজ্ঞাসা, সত্যের সন্ধানে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে দেখার প্রয়াস নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বিনা বিচারে ও বিশ্লেষণে, শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছুকে গ্রহণ তিনি করেন নি। যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন, স্থান নিয়েছেন ব্যারিকেডের পাশে—তখনও অবসান হয়নি প্রশ্ন ও বিচারের। সেজন্য নতুন যুগের বন্ধুরা বহুবার তাঁকে ভুল বুঝেছে। তবু তিনি যুক্তি ও বিচারের এবং সত্যদৃষ্টির পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন। রোলাঁকে যদি সত্যি বুঝতে হয় এবং তাঁর সত্যসাধনা থেকে শিক্ষা নিতে হয় তবে এই দিকগুলির সম্বন্ধে নীরব থাকা চলে না। সুখের বিষয় এই যে, তিনি নিজেই 'আত্মসমীক্ষা' লিখে গিয়েছেন 'I will not rest'-নামক বইটির ভূমিকায়, এবং 'Rolland Par Lui-meme' (নিজের চোখে রোলাঁ) নামক বইটিতে। দ্বিতীয়টি পড়ার সুযোগ আমার হয়নি, তাই প্রথমটিকে আশ্রয় করেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

রোলাঁ জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন মহান ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আদর্শকে সম্বল করে। কিন্তু সেই বিপ্লব যে ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্ম দিয়েছিল তার অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া অনেকদূর এগিয়ে গেছে ততদিনে। অবক্ষয়ী সমাজের নৈতিক দেউলিয়াপনা, ভণ্ডামি, ভীরুতা ও দুর্বলতার স্বরূপ তরুণ পথিকের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বিমূর্ত মানবতাবাদ, দেশপ্রেম ও সামাজিক ন্যায়ের আদর্শকেই সম্বল করে তাতে পুনরায় প্রাণসঞ্চারের ব্রত গ্রহণ করলেন। জাতির আত্মবিশ্বাস তথা আদর্শে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে সমাজকে কর্ম ও ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন তাঁর নাটকগুলির মাধ্যমে। তাঁর আবেদন ছিল প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী অংশ বা 'এলিটে'র প্রতি, তারাই জাতিকে নতুন করে পথ দেখাবে। তবে আবেদনকে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না, গণমনকে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—এই উপলব্ধি থেকেই তিনি গণনাট্য-আন্দোলন সৃষ্টির কাজে উদ্যোগী হন। সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিমূর্ত মানবতাবাদ বা সামাজিক ন্যায় ও দেশপ্রেমের আদর্শ যে কি-ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে সে কথা রোলাঁ উপলব্ধি করেন কয়েক বছর অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যে-সব তরুণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে গিয়েছে তাদের অনেকে রোলাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া কর্ম ও ত্যাগের প্রেরণার দ্বারাই তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। অথচ রোলাঁ নিজে তখন ঐ যুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পেরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

রোলাঁর সেই উপলব্ধি অর্জিত হয়েছে অনেক কঠিন মূল্যের বিনিময়ে। নিজের জীবনপ্রভাতের পথ হাতড়াবার কাহিনীকে তিনি তাঁর মানসপুত্র 'জাঁ ক্রিস্তফে'র মধ্য দিয়ে অনবদ্য রূপদান করেছেন। তাঁর নিজের কথায়—'ক্রিস্তফ' ছিল এক অশান্ত পথিক, যে ছুটে চলেছে 'আলোকের সন্ধানে'—তার সম্বল ছিল প্রশস্ত হৃদয় কিন্তু 'মস্তিষ্ক' অর্থাৎ কোন সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত সামনে ছিল না। যে আলোকের দিকে সে ছুটে চলেছে তার সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। তাছাড়া তার চরিত্রের মধ্যে ছিল একটি মূল দ্বন্দ্ব। প্রাণের বলিষ্ঠ স্পন্দন, পরিপূর্ণ জীবনের তাগিদ রয়েছে তার মধ্যে, তবে সে চায় এই প্রাণ-শক্তিকে একান্তভাবে তার শিল্পসাধনার কাজে নিযুক্ত করতে। সে খোঁজে এমন এক গভীর অন্তরজীবন যা প্রশান্তির আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। অথচ তার যাত্রাপথের প্রতিপদে দেখা দেয় কঠিন সংঘাত—সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে, অন্য মানুষের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। অন্তরজীবনে কোন ফাঁকিকে প্রশ্রয় দিতে চায় না বলেই সে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়, সংগ্রামকে এড়িয়ে যায় না বরং তাকেই নেয় জীবনের মূলমন্ত্ররূপে। অন্তরজীবনের প্রতি রোলাঁর এই অনুরাগকে অনেকে আধ্যাত্মিকতা বলে মনে করেন। ভারতের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিকে যে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই অনুরাগ। কিন্তু রোলাঁ একদিকে যেমন বহির্জগতকে পরিহার করে কল্পলোকে প্রশান্তি খোঁজেন নি, অন্যদিকে তেমনি অন্তর ও বাহিরের প্রকৃত সম্বন্ধ, অন্তরজীবনের আসল উৎস সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছেন। সমাজমানস ও ব্যক্তিমানসের সম্পর্ককে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সত্যসাধনা নতুন সমাজ রচনার লড়াইতে অকুণ্ঠভাবে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কি কঠিন সে সাধনা! পুরাতন আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, প্রকট হয়ে পড়ছে তার অন্তঃসারশূন্যতা অথচ নতুনের রূপরেখা তখনও দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি—এরি মাঝে পথ করে এগোতে হয়েছে শুধু সত্যনিষ্ঠাকে সম্বল করে। তবু তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছেন, থেমে থাকেন নি বলেই তাঁর সত্তা খণ্ডিত বা দ্বৈত-ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে ওঠেনি।

জাঁ ক্রিস্তফ সংগ্রাম চায়নি কিন্তু যখন তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে

এড়িয়েও যায়নি। শ্রমজীবী মানুষের সন্তান সে, তাদের জীবনের দুঃখকষ্টের ভাগীদার এবং সংগ্রামের অংশীদার হতে হয়েছে। সে জানে না তার যাত্রার শেষ কোথায়, কি তার লক্ষ্য। তবু অজানা আলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে প্রবল আশাবাদ নিয়ে। রোলাঁ 'জাঁ ক্রিস্তফ' বইটির পরিসমাপ্তি যে-ভাবে করেছেন তাতে ঐ আশাবাদেরই প্রতিধ্বনি নির্ভুলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সেই নূতন তার সামনে দেখা দিল এক শিশুর রূপে। ক্রিস্তফের প্রশ্নের উত্তরে শিশু আত্মপরিচয় দিয়ে বলে, 'আমি সেই দিন যে আছে নবজন্মের প্রতীক্ষায়' ('I am the day to be born')। পরবর্তী কালে এই প্রসঙ্গে রোলাঁ বলেছেন, ক্রিস্তফ যে-আলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে তা হল যুদ্ধ ও বিপ্লব। সে নিজের অজানিতে নিজেকে ও তার যুগকে নদী-পার করে ভাবীকালে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হল তখন রোলাঁ দেখলেন যে, মানবপ্রেম, বিশ্ব-সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা, সত্য, ন্যায় প্রভৃতির বনিয়াদ কেমনভাবে হঠাৎ ধ্বসে পড়ে গেল। বীভৎসমূর্তিতে দেখা দিল ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কুৎসিত লোভ, ক্ষমতামত্ততা, জাতি-বিদ্বেষ, মানুষে-মানুষে ঘৃণা এবং অবিশ্বাস। রোলাঁ সবচেয়ে বড় আঘাত পেলেন যুদ্ধরত দেশগুলির বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা দেখে। তাঁদের এক অংশ প্রকাশ্যভাবে নিজ-নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নিলেন, আর এক অংশ রইলেন নীরব হয়ে। রোলাঁ বলেছেন যে, এইরকম সংকট-মুহূর্তে নীরবতাও প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করে। কিন্তু নিজেও তখন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সক্রিয় পন্থা খুঁজে পাননি। ক্রিস্তফের মত নিজেও প্রতিবাদ জানালেন পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে গিয়ে—নিজেকে 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' বলে।

'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' বলে বইখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা ও কুৎসার অভিযান শুরু হল। বিচ্ছেদ ঘটল অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি সুইজারল্যান্ডে। প্রথম আঘাতের বিহ্বলতা কাটিয়ে যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও নতুন বন্ধুলাভ করলেন। লেনিন প্রমুখ যে-সব রুশবিপ্লবী তখন সুইজারল্যান্ড-প্রবাসী—তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। বিভিন্ন দেশের যে-সব বিবেকবান মনীষী নিজেদের যুদ্ধোন্মাদনার ঊর্ধ্বে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। এই সময়ের মনোভাব সম্বন্ধে তিনি 'I Will not rest' বইটির 'Panoraina' নামক অংশে লিখেছেন যে, জাঁ ক্রিস্তফের মত তার স্রষ্টাও আশা করেছিলেন যে, দুর্গম যাত্রার শেষে শান্তির পরিবেশ খুঁজে পেয়ে সেখানে নিশ্চিন্তে শিল্পসাধনার অধিকার অর্জন করেছেন।

কিন্তু ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে সেই শান্তির দ্বীপ থেকে বাইরের আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। প্রথমটায় তিনি সেই শান্তির রাজত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ও তাকে যুদ্ধের ঊর্ধ্বে স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঊর্ধ্বে থাকার আগ্রহই অনেকটা তাঁর অজ্ঞাতে তাঁকে টেনে নিয়ে এল যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের অধিকারের ঘোষণা যে কতখানি অসার তা তিনি উপলব্ধি করলেন। আদর্শের নামে ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ।

রোলাঁ বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কেউ অভিযোগ করেছে এই বলে যে, তিনি বে-আইনীভাবে সমাজ-চিন্তাকে শিল্পের ক্ষেত্রে আমদানি করেছেন। জবাবে তিনি বলেছেন যে, জাঁ ক্রিস্তফ শুধু শিল্প নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু সমাজ-বাস্তবই তার দরজা ভেঙ্গে শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে। সত্যের খাতিরে সে তাকেস্বীকার করে নিয়েছে, পলায়নে আত্মরক্ষা করতে চায়নি।

রুশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে অভিনন্দন জানান এবং বিপ্লবের পক্ষ গ্রহণ করেন। তখনও এবং তার পরেও কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁর কাছে বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্ট ছিল না। তখনও মনে অনেক প্রশ্ন, দ্বিধা ও সংশয় রয়ে গেছে। 'মনের পৌরোহিত্য' (Priesthood of the mind)-এর প্রতি আস্থাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে, সংস্কার-মুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরাই সামাজিক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। সমাজ-বিপ্লবের পক্ষ নিলেও নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন, মন বা বুদ্ধির স্বাধীনতার অধিকার দৃঢ়ভাবে বজায় রাখতে চেয়েছেন। তাই বিপ্লবের পক্ষ নিলেও সেই সময় তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য আলাদা। বুদ্ধিজীবীরা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে শ্রমজীবী বাহিনীকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

উপরোক্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের এক আন্তর্জাতিক-সংঘ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'চিন্তার স্বাধীনতা ঘোষণা' নামে একটা সনদ রচনা করে বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মানুষের সামনে উপস্থিত করেন। সেই ঘোষণাপত্রের মর্মবাণী এই ছিল যে, বুদ্ধিজীবীরা আর কখনও যুদ্ধবাদীদের দুষ্কর্মে সাহায্য করবেন না। তারা জাতি ও দেশ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভাই বলে গ্রহণ করবেন এবং জাতি, ধর্ম, সীমান্ত, সংস্কার ইত্যাদির বন্ধন-মুক্ত হয়ে একমাত্র সত্যের পক্ষে দাঁড়াবেন। এতে অনেক খ্যাতনামা মনীষী স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ডঃ আনন্দকুমার স্বামী।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে রোলাঁর মোহভঙ্গ হল অচিরেই। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী, বিশেষত ইউরোপ তখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তার সামনে সব চাইতে বড় প্রশ্ন—আবার যুদ্ধ, না বিপ্লব? একটিকে বেছে নিতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বিপ্লবকে বেছে নিতে অসমর্থ হয়ে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যোগ দিলেন। অন্যেরা রইলেন নীরব দর্শক রূপে। এক ক্ষুদ্র অংশ আদর্শের প্রতি সততা রক্ষা করলেও দারুণ মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে দোদুল্যমান হতে থাকলেন। রোলাঁ অভিজ্ঞতার ফলে আর একটি কথাও বুঝতে পারলেন—বিমূর্ত ন্যায়, মানবপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি নীতির ভিত্তিতে যে-সব আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত সেগুলি অতি সহজেই ধূর্ত প্রতিক্রিয়াবাদীদের দ্বারা কবলিত হয়ে পড়ে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে রোলাঁ নিজেও কম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হননি। তিনি সমাজবিপ্লবকে নতুন পৃথিবী-সৃষ্টির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করেন কিন্তু বিপ্লবে হিংসা ও রক্তপাতের আতিশয্যে মন বিচলিত হয়। বিপ্লবের প্রতি সমর্থনের নামে অন্ধ আনুগত্যের দাবীকেও তিনি মেনে নিতে পারেননি। এই সময়ে তাঁকে দুই রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে হয়েছে—একদিকে বিপ্লবের রুদ্রমূর্তিতে ভীতসন্ত্রস্ত বুদ্ধিজীবীদের পলায়নবাদ, অন্যদিকে অল্প-সংখ্যক যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়ে বিপ্লবের পক্ষে যোগ দিয়েছেন তাঁদের অতি উগ্র অসহিষ্ণুতা।

যে-সব বুদ্ধিজীবী যুদ্ধের সময় বিমূর্তভাবে মানুষের জীবনের মূল্য, ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা প্রভৃতির পতাকা তুলে ধরেছিলেন তাঁরা বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের হিংস্রতার সামনে নিজেদের অসহায় বোধ করেন। অনেকে প্রতিক্রিয়ার পক্ষে যোগ দেন। ফলে বিপ্লবী শ্রমজীবী মানুষের মনে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই ব্যবধান যাতে বেড়ে না চলে সেজন্য তিনি সচেষ্ট হন।

রোলাঁ কি-ভাবে বিপ্লবের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন সে কাহিনীর অনবদ্য রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায় 'বিমুগ্ধ আত্মা' (L' Ame Enchantee) নামক উপন্যাসে। তখনও সমাজবিপ্লবের দর্শন তাঁর সামনে পরিষ্কার রূপ ধারণ করেনি। উপরোক্ত উপন্যাসের নায়িকা বিপ্লবের পক্ষে যোগ দিয়েছে যতটা হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ততটা যুক্তির দ্বারা নয়। ক্রিস্তফের মত আনেৎও ছিল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিন্তু তারা উভয়েই কখনও সমষ্টির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। এক হিসাবে বলা যায় যে, তাদের চেতনা ছিল সমষ্টির বিবেকের প্রতিরূপ। কিন্তু যখনই তাদের চিন্তার স্বাধীনতার উপরে আঘাত এসেছে তখনই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত রকম অন্যায়ের ও

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করাই হল বিবেকবান বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য —এই অবিচল বিশ্বাসই তাদের সংগ্রামী জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছে। 'বিমুগ্ধ আত্মা'র মুখবন্ধে রোলাঁ যে কয়টি কথা লিখেছিলেন তা তাঁর এই সময়ের মর্মবাণীকে প্রকাশ করে—'to seek, to strive—not to find and not to yield' (সন্ধান করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে—সন্ধান পাবে না, তবু হার মানা চলবে না।)

১৯১৯ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত চলেছে একাধারে সন্ধান ও আত্মজিজ্ঞাসা এবং দুই রণাঙ্গণে সংগ্রাম। বিপ্লবী রুশিয়ার বিরুদ্ধে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অবরোধসৃষ্টির ষড়যন্ত্র করেছে তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলার জন্য তিনি জানিয়েছেন অমোঘ আহ্বান, ফ্রান্সের ভিতরে প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থী শক্তির ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। জার্মানীতে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে লিবনেখট ও রোজা লুকসেমবুর্গের হত্যার প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠ গর্জন করে উঠেছে। তারপরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদীয়মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের মিলিত প্রতিরোধ গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এজন্য দক্ষিণদিক থেকে তাঁর উপর আক্রমণ এসেছে। অভিযোগ এসেছে যে, যিনি ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি কেন এক পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছেন। অভিযোগের অমোঘ উত্তর দিয়েছেন তিনি, বলেছেন যে, তিনি যার উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছেন তা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কিন্তু যখন সংঘাত বেঁধেছে প্রতিবিপ্লব আর বিপ্লবের মধ্যে তখন তিনি বিপ্লবের পক্ষ নিয়েছেন।

কিন্তু বাম, বিশেষত ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ঐ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসহিষ্ণু আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। আঁরি বারবুস আর মার্সেল মার্তিনে ছিলেন তার প্রবক্তা। এঁদের দুজনের সঙ্গেই রোলাঁর যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। বারবুসের সমালোচনা অসহিষ্ণু হলেও ভাষার দিক থেকে সংযত, মার্সেল মার্তিনের অত্যন্ত উগ্র। রোলাঁ যে বিপ্লবের পক্ষ অবলম্বন করেও তার ভুলত্রুটির সমালোচনা করতেন এবং চিন্তার স্বাধীনতার দাবীকে আঁকড়ে ধরেছিলেন সেইজন্যই পরিচালিত হয়েছিল ঐ আক্রমণের অভিযান।

পরবর্তীকালে রোলাঁ আলোচ্য সময়ে নিজের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করে যা বলেছেন তাকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত, তিনি প্রতিবিপ্লব ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিলেও সংগ্রামী দলগুলির থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তখনও এই ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে, বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে আত্মিকশক্তির সাহায্যে ক্ষমতাসীন দলের সমস্ত কার্যকলাপকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে তার

সম্বন্ধে রায় দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। এই ধারণা থেকেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের বুর্জোয়া-সংস্কারপন্থী চরিত্র তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি এক আবেদন পাঠিয়েছিলেন। ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ২৬ জন সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী এই আবেদনের উত্তরে জানান যে, তাঁরা বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও চিন্তার স্বাধীনতাকে শর্তহীনভাবে বজায় রাখার পক্ষপাতী।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় ছিল। শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব, মার্কস-লেনিনবাদী বিপ্লবী-তত্ত্বকে অভ্রান্ত তথা চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল। বারবুসের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে উক্ত মত প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, ঐ তত্ত্বের ও কার্যক্রমের সাফল্য যে অনিবার্য তা বলা যায় না ; তবে সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে পেঁছাবার বাস্তব সম্ভাবনা তারই রয়েছে।

প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লবী হিংসার প্রয়োজন স্বীকার করেও তিনি তার আতিশয্য সমর্থন করেননি। বিশেষত মনের বিরুদ্ধে হিংসা (Violence against the mind) এবং তার সমর্থনে যুক্তিদানের তীব্র সমালোচনা করেন। বারবুসের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে, বিপ্লবের সময়ে যখন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলে ঠিক তখনই নৈতিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বুদ্ধিজীবী হিসাবে আমরা বিপ্লবের আক্রমণ থেকে সেই নৈতিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা কর্তব্য মনে করি। বারবুসকে লেখা অপর একটি চিঠিতে তাঁর তদানীন্তন মনোভাবের সারমর্ম ফুটে উঠেছে। তাতে লেখেন যে, তিনি প্রগতির জন্য শ্রমজীবীবাহিনীর সঙ্গেই আছেন, তবে চোখ বুজে বা মুখ বন্ধ করে নয়।

উত্তরকালে আত্মসমালোচনার ফলে তিনি উপরোক্ত মনোভাবের অন্তর্নিহিত ভুলত্রুটিগুলি উপলব্ধি এবং অকপটে স্বীকার করেন। তার মর্মার্থ নিম্নরূপ : বুদ্ধির বিমূর্ত স্বাধীনতাকে বাস্তবভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের জয় অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। বিপ্লব যদি পরাজিত হয় তবে সেই বুদ্ধির স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে ও তার গ্যারান্টি দেবে কে ?

বিপ্লবের জয়ের জন্য শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের সংগ্রামী দলগুলির সঙ্গে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একাত্মতা নিতান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধির কল্পিত স্বাধীনতার নামে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা সেই ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর

একনায়কত্ব হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব তথা শ্রেণীভেদ-বিলোপের পক্ষে একটি অপরিহার্য সাময়িক পদক্ষেপ। তাকে চিরকালীন মনে করে আতঙ্কিত হওয়াটা ভুল।

কিন্তু আত্মসমালোচনার পরেও একটি প্রশ্ন তিনি রেখেছিলেন যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আজও তার তাৎপর্য নিঃশেষিত হয়নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য মানেই কি অন্ধ আনুগত্য অর্থাৎ বিপ্লবের নামে যা-কিছু অনুষ্ঠিত হবে তাকেই নির্বিচারে, বিনা প্রশ্নে, সমর্থন করে যেতে হবে? যদি বুঝি যে, অনেক ভুলত্রুটি হচ্ছে এবং সেগুলি না শোধরালে বিপ্লবের জয়-যাত্রায় বাধার সৃষ্টি হবে তবে সেগুলিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা করে দেখিয়ে দেব না কেন?

ফরাসী কমিউনিস্টদের অত্যুগ্র অসহিষ্ণুতার ফলে তাদের সঙ্গে রোলাঁর সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটার উপক্রম হয়েছিল। কমিউনিস্টরা রোলাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের দোদুল্যমানতা, সংগ্রাম-বিমুখতা ও ভুয়া স্বাতন্ত্র্য-বোধ প্রভৃতিকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু রোলাঁর মনের বিশেষ প্রশ্ন ও সংশয়-গুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার বা তার যুক্তিনিষ্ঠ জবাব দেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি। তাঁরা দাবী করেছিলেন অন্ধ আনুগত্য এবং তা দিতে অস্বীকৃত হওয়ার অপরাধে রোলাঁকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। যাঁরা তার মুখের উপরে বিপ্লবী-শিবিরের দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হন তাঁদের জবাবে রোলাঁ লেখেন যে, 'বিপ্লব কোন দলের সম্পত্তি নয়। যারা মানবতার জন্য উজ্জ্বল এবং সুখী ভবিষ্যতে বিশ্বাসী তাদের সকলের জন্যই সেই প্রাসাদে স্থান আছে।'

কমিউনিস্টদের সঙ্গে রোলাঁর অপর একটি গুরুতর মতবিরোধ ছিল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে। ফরাসী কমিউনিস্টরা তখন এই প্রশ্নে নেতিবাচক বর্জনমূলক মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। রোলাঁর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

উভয়ের ব্যবধান ক্রমে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠত। সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলি ঘটনা ঘটে যা সেই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা দূর করে রোলাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্টদের অন্তরঙ্গ সহযোদ্ধায় পরিণত করে। ১৯২৭ সালে যখন সাম্রাজ্য-বাদীদের পক্ষ থেকে নতুনভাবে সোভিয়েত রুশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ-সৃষ্টি ও আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় তখন তিনি রুশিয়ার পক্ষে দাঁড়াবার জন্য বিশ্বের প্রগতিশীল জনমতের কাছে আহ্বান জানান। রুশিয়া থেকে পলাতক কয়েকজন সোভিয়েত-বিরোধী লেখক রোলাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন সেখানকার নির্যাতিত লেখকের পক্ষ অবলম্বন করেন। তার জবাবে রোলাঁ লেখেন যে, রুশিয়া আজ বিপন্ন। যদি বিপ্লবী রুশিয়ার অস্তিত্ব মুছে যায়

তবে পৃথিবীতে লেখকের স্বাধীনতা বলে কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকবে না। একদল বুদ্ধিজীবী যুগপৎ ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৃতীয় আন্দোলন গড়ে তোলবার যে প্রস্তাব করেছিলেন তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতেও রোলাঁ অস্বীকার করেন। 'লিবার্তেয়ার' নামক একটি পত্রিকায় রোলাঁর 'রুশিয়া বিপন্ন'-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর সোভিয়েত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে লুনাচারস্কী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং 'বিপ্লব ও সংস্কৃতি' (Revolution and Culture) নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ জানান।

এই প্রসঙ্গে রোলাঁ লিখেছেন যে, সোভিয়েতের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ব্যাপক উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের ফলে তাঁর দিক থেকেও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করার পথ প্রশস্ত হয়। লুনাচারস্কীর চিঠির উত্তরেও তিনি সোভিয়েত গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু সমালোচনা করেন, তবে সোভিয়েত বিপ্লবকে মানবতার শক্তিশালী অগ্রগতিরূপে অভিনন্দন জানান।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ১৯২২ সালে গোর্কীর সঙ্গে রোলাঁর যে পত্র-বিনিময় হয় তাতে গোর্কী বারবুসের মতের বিরুদ্ধে রোলাঁকেই সমর্থন করেছিলেন। তারপর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে স্তালিনের কতকগুলি মতামত, বিশেষত ১৯৩৪ সালে ফিরদোসীর জন্ম-সহস্রবার্ষিকী-উৎসব উপলক্ষ্যে সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তৃতা রোলাঁর সমস্ত সংশয় দূর করে দেয়। তিনি শুনতে পান এক যুগান্তকারী ঘোষণা—শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি হল মানবসংস্কৃতির, মানবতার বিকাশের প্রক্রিয়ায় অর্জিত চিন্তা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী।

লুনাচারস্কীর মাধ্যমে সেভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রোলাঁর প্রত্যক্ষ ও বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্বন্ধ গড়ে ওঠার পর থেকে আর তাঁকে দুই রণাঙ্গণে লড়াই করতে হয়নি। তখন থেকে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে দেখতে পাই ফ্যাসিবাদ ও সমাজবাদের বিরুদ্ধে অশ্রান্ত সংগ্রামে নিযুক্ত সৈনিক হিসাবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বকংগ্রেসে, আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে শান্তিযোদ্ধাদের বিশ্বসম্মেলন-অনুষ্ঠানের কাজে তিনি অন্যতম অগ্রণী কর্মী-রূপে কাজ করেছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশে নিপীড়িত জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তাঁর লেখনী উদ্যত হয়েছে। সত্যিই, তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি।

রোলাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়গুলি থেকে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উত্তরণের অভিজ্ঞতা সত্য ও ন্যায়ের পূজারী সমস্ত বুদ্ধিজীবীর সামনে চির-উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর উত্তরজীবনের অভিজ্ঞতা, বিশেষত কমিউ-নিস্টদের সঙ্গে মতদ্বন্দ্বের ঘটনা থেকে মার্কসবাদীদের পক্ষেও শিক্ষণীয় বিষয়

কি নেই ? অন্যের মতামত সম্বন্ধে উদ্ধত অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে তাঁরা যে বহুক্ষেত্রে সম্ভাব্য মিত্রকে শত্রুপক্ষে ঠেলে দিতে উদ্যত হন সেই ভুলের বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আজও যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে। সৎ অথচ সংশয়াচ্ছন্ন প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে যে তাঁদের বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনা যায়, সে শিক্ষার কথা মনে রাখার প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। তা ছাড়া ফরাসী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মতদ্বন্দ্বে তিনি যে-সব প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সবটুকুই ত ভুল ছিল না। বিপ্লবী আন্দোলনের ভুলত্রুটির বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তথা আত্মসমালোচনার প্রয়োজন যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে সে কথা ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও বিশ্বকমিউনিষ্ট-আন্দোলনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অনস্বীকার্যরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ফরাসী কমিউনিস্টরা যখন রোলাঁর কাছে অন্ধ আনুগত্য দাবী করছিলেন সেই সময়ে গোর্কী এক চিঠিতে লেখেন যে, রোলাঁর নিজের পক্ষে যেমন আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে তেমনি রয়েছে তার থেকে ভিন্ন-মত-পোষণ-কারীদের অর্থাৎ বিপ্লবের নেতাদের পক্ষে। গোর্কীর চিঠি এবং বিপ্লবী আন্দোলনের আত্মসমালোচনার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে লেনিনের একটি বক্তৃতা, এই দুটি দিক থেকে সমর্থন না পেলে সেদিন রোলাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হত যে, ফরাসী কমিউনিস্টদের উগ্র অসহিষ্ণুতাই বুঝি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধর্ম। বারবুসের কাছে লিখিত চিঠিগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন। তার মর্ম এই যে, বারবুস ও তাঁর বন্ধুরা সমাজ-বিপ্লবপ্রবাহ এবং মানুষের মনে তার প্রতিফলনকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেন ; তাঁরা সমাজবিপ্লবের তত্ত্বকে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সূত্রে পরিণত করে ফেলেন এবং নিশ্চিতভাবে ধরে নেন যে, সেখানে কোনরকম ভুলচুকের অবকাশ নেই। রোলাঁর এই বক্তব্যে যে সত্য ছিল সে কথা ত বিশ্বকমিউনিস্ট-আন্দোলনের নেতাদের বহু বক্তব্য থেকে এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তবু কি আমরা মার্কসবাদীরা সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হতে পেরেছি ?

১৯২৫ সালে সোভিয়েত 'স্টেট অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সসস্ অ্যান্ড আর্টস'-এর এক সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে রোলাঁ লেখেন যে, 'সত্যকার বিপ্লবী মনোভাব কখনও জীবনের রূপগুলিকে জড়ীভূত হতে বা প্রাণের প্রবাহকে থেমে যেতে দেয় না। সেই মনোভাব কোনরকম সামাজিক মিথ্যাচারণকে প্রশ্রয় দেয় না। মানবসমাজ পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন যে কুসংস্কারের আবর্জনা সঞ্চয় করে তার সঙ্গেও বিপ্লবী মনোভাব ক্ষমাহীনভাবে সংগ্রাম চালায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের

কুসংস্কারের মত শ্রমিক-বিপ্লবের অঙ্গীভূত কুসংস্কারগুলিকে তা বরদাস্ত করে না। তার কাছে কোন কিছুই শাশ্বত নয়। তার চোখে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সাময়িক মাত্র। সুতরাং এইধরণের বিপ্লবী মনোভাব থেকে যে শিল্প জন্ম নেয় তা সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। তার লক্ষ্য হল সমগ্র সত্য এবং সেই সত্য সন্ধানের পথে তা শ্রমিক-বিপ্লবের সৈনিকদের সহযাত্রী হয়, তবে স্বাধীন সহযাত্রী। তা কোন একটি মাত্র শ্রেণীর জন্য নয়, সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে। এক শ্রেণীর মানুষ অত্যাচারিত নতুবা অত্যাচারী হয়ে থাকবে এমন ব্যবস্থা আমরা কখনও সহ্য করব না।'

এই চিঠির শেষের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে যে সংশয় বা বিপ্লবীবাহিনীর থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাকে রোলাঁ পরে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন। কিন্তু চিঠির প্রথমদিকে যে প্রশ্নগুলি তিনি উত্থাপিত করেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মার্কসবাদের সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে চিন্তার অনেক জড়তা, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে সে কথা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

রোলাঁ যে প্রশ্ন তুলেছেন তার কোন অতিসরলীকৃত জবাব দেওয়া চলে না। সমাজতান্ত্রিক দেশে চিন্তার জড়তা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে ধনতান্ত্রিক জগতের অবক্ষয়ী শিল্পের অনুকরণের ঝোঁক আত্মপ্রকাশ করতেও দেখা গেছে। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে, তত্ত্বকে জ্যামিতিক সিদ্ধান্তের মত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা সার্থক শিল্পসৃষ্টির পথে প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বর্তমানে এই প্রশ্ন নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে। তাঁরা একদেশদর্শিতার বদলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমগ্র সত্যকে রূপায়িত করায় উদ্যোগী হয়েছেন। শিল্পী রোলাঁর জীবনবেদ তাঁদের পথকে আলোকিত করবে।

ভ্রম সংশোধন

পিছনের প্রচ্ছদের ২৩ লাইন থেকে ২৫ লাইন পড়তে হবে :

১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক বন্দী। ঐ বৎসরই মে মাসে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মুক্তি। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট দলের অন্যতম সহকারী নেতা।